শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্‌যাম রহ.

আবদুস সাত্তার আইনী
অনূদিত

শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.

লাল কর্কট

[কমিউনিজম-বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ]

অনুবাদ
আবদুস সাত্তার আইনী

লাল কর্কট
শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.
অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী
সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ
প্রকাশক
মুঈনুদ্দীন আহমাদ গালিব
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান
সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র	বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা	ইসলামি টাওয়ার(২য় তলা)
ঢাকা-১২১২	বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১১৬২০৪৪৭	০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৬১৫	০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ২০০ [দুইশত] টাকা মাত্র

LAL KARKAT
Writer : Shaheed Dr. Abdullah Azzam RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 200 .00
ISBN : 978-984-90977-9-2
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

অনুবাদকের কথা

রচনাটির নাম কেনো 'লাল কর্কট' রাখা হয়েছে এ-বিষয়ে কিছু কথা বলা দরকার। আমি আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.-এর যে-গ্রন্থটির অনুবাদ করেছি তার নাম السرطان الأحمر। এই শব্দবন্ধের আক্ষরিক অর্থ 'লাল কর্কট'। কর্কট শব্দটি কেবল কাঁকড়া বোঝায় না, কর্কটব্যাধিও (Cancer) বুঝিয়ে থাকে। লাল বলা হয়েছে এ-কারণে যে কমিউনিস্টদের প্রতীক হলো লাল তারকা (Red Star)। তাদের হাতুড়ি-কাস্তের যে-প্রতীক তা-ও লাল রঙের। তাদের যে-পতাকা সেটার রঙ লাল; তারা যে-টুপি পরে সেটার রঙ-ও লাল; তাদের সশস্ত্র কর্মীবাহিনীকে বলা হয় লাল ফৌজ এবং চে গুয়েভারার যে-টুপি কমিউনিস্টদের কাছে বেশ প্রিয় তাতেও আছে একটি লাল তারা। 'লাল শার্ট' বিপ্লবী ও নৈরাজ্যবাদীদের প্রতীক বলে বিবেচিত। 'লাল পুস্তক' (Red Book) নামে একটি বিখ্যাত বই আছে মাও সে-তুংয়ের লেখা। কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের নিয়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছে বলে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে এর নাম রাখা হলেছে 'লাল কর্কট'।

আরও একটি কথা বলা দরকার। লেখাটির মধ্যে তৃতীয় বন্ধনী—[]-তে যা বলা হবে তা আমার বক্তব্য নয়; লেখকের বক্তব্য। তবে দ্বিতীয় বন্ধনী—()-তে যে-পরিভাষা বা শব্দ থাকবে তা আমার। তা ছাড়া আমি ব্যক্তিপরিচিতি, টীকা ও পরিশিষ্ট সংযোজন করেছি। এ-ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি হলে তার দায়-দায়িত্ব আমার এবং কারো নজরে এলে আমাকে জানানোর অনুরোধ রইলো।

'ফিলিস্তিনের স্মৃতি' ও 'সিরাত থেকে শিক্ষা'র মতো এ-রচনাটিও ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক রহমতে' প্রকাশিত হয়েছিলো। শহীদ আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.-এর রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত ও সহায়তা করেছেন মাসিক রহমত-এর সম্মানিত সম্পাদক মাওলানা মনযূর আহমাদ দা. বা.। তিনি তাঁর পত্রিকায় আমার অনূদিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করারও ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর প্রতি থাকলো আমার হৃদয়ের গভীরতা থেকে উৎসারিত অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com

সূচি

উৎসর্গ

যাঁরা সত্যকে জানতে চান, আলো গ্রহণের জন্য চোখ খোলা রাখেন এবং নেকড়ের দাঁত ও হিংস্র জানোয়ারের থাবায় সহজ উপভোগ্য শিকারে পরিণত হওয়া থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকেন।

আমি এই বিনীত আলোচনাটি মহান আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদন করছি; তিনি তা কবুল করুন এবং আখেরাতে আমাদের পুণ্যের পাল্লাকে ভারী করুন। আলোচনাটি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; তিনি এর মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন এবং আমাদের মাধ্যমে তাঁর দীন উপকৃত হোক।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

'হে আমাদের প্রতিপালক, সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলঙ্ঘনপ্রবণ করো না এবং তোমার কাছ থেকে আমাদের করুণা বিলাও, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।'[১]

আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দা
আবদুল্লাহ আয্‌যাম

[১] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৮।

গ্রন্থ সম্পর্কে

এই গ্রন্থ আলোচনা করেছে—

১. বর্তমান সময়ে (সত্তরের দশকে) মানুষের ভেতরে যে-চিন্তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার—নাস্তিক্যবাদ সৃষ্টিকারী সাম্যবাদ বা কমিউনিজম—সম্পর্কে;

২. এই নিকৃষ্ট মতবাদ সৃষ্টির পেছনে ইহুদিদের কালো হাত, আরবে চিৎকার-চেঁচামেচি করা কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ (যারা কুফরি করে তাদের উপমা যেমন কোনো ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না—বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তারা বুঝবে না[২]) সম্পর্কে;

৩. কমিউনিজমের বিস্তার ঘটার কার্যকারণ, এবং চিন্তা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে কীভাবে এই মতবাদের পতন শুরু হয়েছে এবং তার কারণ কী—তার সম্পর্কে।

আপনারা এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে পাবেন। আমরা আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য ও তাওফিক প্রার্থনা করি।[৩]

---

[২] সুরা বাকারা : আয়াত ১৭১।

[৩] মূল গ্রন্থ السرطان الأحمر-এর তিনটি কপি আমার কাছে আছে; একটি আরব থেকে প্রকাশিত এবং দুটি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত। এই ভাষ্য আরব থেকে প্রকাশিত কপিটির শুরুতে এবং পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত কপি দুটির শেষে বন্ধনীহীনভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটি আবদুল্লাহ আয্যামের ভাষ্য নয়।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে আমাদের নফ্সের অনিষ্টতা ও কর্মের অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং তাঁর কোন শরিক নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বান্দা।

তারপর কথা এই যে—

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই—যখন আমি শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম সত্তরের দশকের শেষ বছরগুলোতে লাল কর্কট নামে যে-গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তার ভূমিকা লিখছি—যে, এই গ্রন্থটির একটি ভূমিকা প্রস্তুত করার অভিপ্রায় তাঁর ছিলো—এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এসে এখন গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হচ্ছে—যাতে তিনি (রহ.) ইসলামি ইতিহাসের বিশ্লেষণধারার ক্রমোন্নতি এবং কমিউনিজম বর্তমানে যে-নিষ্প্রভতা, যে-অধঃপতন ও যে-পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে তা বর্ণনা করতেন। কিন্তু অবধারিত সময় তাঁর ও তাঁর কর্ম-বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে-সকল বীর ও নেতা কমিউনিজমের অস্তিত্বকে তার প্রাসাদের মধ্যস্থলেই গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তিনি তাদের অন্যতম।

১৯৬৮ সালে তিনি বামপন্থী সংগঠনগুলোর কুচকাওয়াজের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন, যে-সংগঠনগুলো ইসলামি উম্মাহর দেহে ভয়ঙ্কর জীবণুর মতো আক্রমণ করতে চেয়েছিলো, তখন তিনি ফিলিস্তিনের ভূমিতে জিহাদ করছিলেন।

যেদিন আফগানিস্তান লাল ফৌজের (রুশ সেনাবাহিনীর) পক্ষ থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলো, সেদিন শহীদ আয্যাম কমিউনিজমের

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি একহাতে কুরআন আর অন্যহাতে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।
আল্লাহ তাআলা শহীদ শায়খের চোখ শীতল করেছেন : তিনি আফগানিস্তানের ভূমিতে রুশ ভল্লুকের—পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে উদ্ধত ও অত্যাচারী শক্তির পরাজয় ও পলায়ন দেখতে পেয়েছেন।
কমিউনিজত তার অনুসারীদের মাথার ওপর ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। একটার পর একটা নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটছে। সব জায়গায় জিহাদের বাতাস বইতে শুরু করেছে। যে-অন্ধকার গোটা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো, এই আলো তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। সব জায়গায় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে : যে-নাস্তিক্যবাদকে কার্ল মার্কস ও তাঁর দুই শিষ্য—লেনিন ও স্ট্যালিন—সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং চূড়ান্ত পতন ঘটেছে।
কমিউনিজম এই যে চরম ব্যর্থতা ও চূড়ান্ত পতনের শিকার হয়েছে, শহীদ আয্যাম সত্তরের দশকের শেষে তা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, কিছুটা সময় পরে হলেও, কমিউনিজমের পতন অবশ্যম্ভাবী।
আমরা এখানে, এই গ্রন্থের ভূমিকায়, শহীদ আয্যামের কথাকটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি : তিনি তাঁর 'আল-ইসলাম ও মুসতাকবালুল বাশারিয়্যাহ' গ্রন্থের ৩৫-৩৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় বলেছেন—

> আমি সভ্যতার (পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যীয়) দু'টি শাখাতেই শীর্ণতা দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু আমি সভ্যতার প্রাচ্যীয় শাখায় দেখতে পাচ্ছি তার শীর্ণতা ও বিবর্ণতা প্রকট ও ব্যাপক। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি,—আল্লাহই ভালো জানেন—বস্তুবাদী সভ্যতা তার দু'টি শাখাসহ শীর্ণ-বিবর্ণ হয়ে পড়েছে এবং তার চূড়ান্ত পতনের সময় বেশি দূরে নয়। কারণ এটাই আল্লাহর নীতি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا

'আমি তোমাদের পূর্বে অনেক জাতিকে ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমা-লঙ্ঘন করেছে।'[৪]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।'[৫]
আল্লাহর বিধান ও নীতি জারি থাকবে প্রত্যেক সভ্যতায় । প্রতিটি সমাজ, জীবন, ও অঞ্চলে বিদ্যমান থাকবে আল্লাহর আইন ও অনুশাসন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا () اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

'কিন্তু তাদের কাছে যখন সতর্ককারী এলো তখন তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো—পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র এর উদ্যোক্তাদেরই পরিবেষ্টন করে রাখে। তবে কি এরা অপেক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনো কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রমও দেখবে না।'[৬]
পৃথিবীতে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং অহঙ্কার দেখিয়ে বেড়িয়েছে। কূট ও কুৎসিত ষড়যন্ত্র তারা করেছে এবং দেশে দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাই তাদের দুই হাত যা রোপণ করেছিলো তার ফসল তারা তুলেছে। وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ—'কূট ষড়যন্ত্র এর উদ্যোক্তাদেরই পরিবেষ্টন করে রাখে।'
তারা ফসল তুলেছে কণ্টক ও দুর্দশার, ফসল তুলেছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও মহামারীর। তারা সন্দেহের বীজ বপন করেছে

---

[৪] সুরা ইউনুস : আয়াত ১৩।
[৫] সুরা ইউনুস : আয়াত ৮১।
[৬] সুরা ফাতির, আয়াত ৪৩।

এবং তুলেছে কাঁটা। আল্লাহকে পরিত্যাগ করার বীজ থেকে তারা ফসল উৎপাদন করেছে নিন্দা, অনুশোচনা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণা, কষ্ট-দুর্দশা, নষ্টতা-ভ্রষ্টতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অস্থিরতা ও আত্মহত্যার।

আমি বলি, আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রাচ্যে বস্তুবাদী সভ্যতায় শীর্ণতা প্রকট, যদিও তা বয়সে নতুন এবং অল্প সময় পার করেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এটি নিজের ভেতরেই গুটিয়ে আসছে এবং সমস্ত বিস্তৃতি নিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। মুহূর্তের পর মুহূর্তে এর অবশিষ্ট জীবন নিঃশেষ হচ্ছে। একারণেই আমি বিশ্বাস করি যে, কমিউনিজমের (সাম্যবাদের) প্রাচ্যীয় শাখার পতন—আল্লাহই ভালো জানেন—অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, পাশ্চাত্য শাখায় স্বাধীনতার অবশিষ্ট সমীরণ, সমালোচনা ও সতর্ক করে যাওয়া কলমগুলোর অবশিষ্টাংশ, লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া জ্ঞান ও বিবেক কমিউনিজমের ভয়ানক পরিণামের প্রতিই ইঙ্গিত করে যাচ্ছে। বোবা হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট মুখগুলো চিৎকার করছে এবং কমিউনিজমের বিভীষিকাময় অতল গহ্বর সম্পর্কে সতর্ক করছে, যে-গহ্বরে মানবতার শোচনীয় পতন ঘটতে পারে।

সে-সময় কোনো কোনো গবেষক চিন্তার একটা পর্যায়ে এসে এ-ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, আল্লাহর সৈনিকদের আঘাতের ফলে কমিউনিজত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউই এটা অনুমান করতে পারেন নি যে, কমিউনিজমকে পরাভূত করতে যেসকল বীরসেনানী নেতৃত্ব দেবেন, অবশ্যই এই গ্রন্থের লেখক হবেন তাঁদের অন্যতম; যে-লাল ঘূর্ণিঝড় ইসলামি বিশ্বকে টুকরো টুকরো করে গিলে ফেলতে যাচ্ছে, —আফগানিস্তানকে দিয়ে শুরু করে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে, তারপর আরব উপসাগরে হামলে পড়েছে এবং উষ্ণজলে পৌঁছে গেছে, তারপর জাযিরাতুল আরবে হামলে পড়েছে—তিনি অবশ্যই তার মোকাবিলা করার জন্য তাঁর অস্ত্র কোষমুক্ত করবেন।

কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি—পশ্চিমা বিশ্বেরও কেউ না আর আরব ও ইসলামি বিশ্বেরও কেউ না—যে, আফগানিস্তানে ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্বে মুজাহিদদের উদ্ভূত শক্তি এবং রুশ ভল্লুকের—পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে উদ্ধত ও অত্যাচারী শক্তির মধ্যকার মোকাবিলায় এই পরিণতির সৃষ্টি হবে যা মুজাহিদদের বিজয়ের ফলে গোটা বিশ্বকে হতভম্ব ও নির্বাক করে দেবে এবং সব জায়গায় মুসলমানদের শিরকে উন্নত করবে। রুশ ভল্লুক তার গর্তে প্রবেশ করেছে আহত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, লাঞ্ছনাগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে—তারা (আফগানিস্তানে আক্রমণ করে) যে-ভ্রান্তি বিলাস করেছে তা পুনরাবৃত্তি করার চিন্তাও কখনো করবে না।

আফগানিস্তানে রুশ কমিউনিস্ট ভল্লুকের এই পরিণাম কোনো কোনো আরব দেশের (সিরিয়া ও ইয়ামানের) কমিউনিস্ট পার্টিকে গর্বাচেভের কাছে চিঠি পাঠাতে বাধ্য করে। তারা চিঠিতে দাবি জানায় যে, গর্বাচেভ যেনো আফগানিস্তান থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে বিলম্ব করেন। কারণ, পরাজয় মেনে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তা আরব বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ওপর চরম বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, রুশ সেনাবাহিনী ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের ভূমিতে পবিত্র জিহাদের জয়লাভ সমস্ত জায়গায় কমিউনিজমের পায়ের নিচের ভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এবং পৃথিবীর বুকে যেসব জনপদে মুসলমানরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত ছিলো সেখানে জিহাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

নিশ্চয় সাম্যবাদী চিন্তাদর্শের—তা নিজের জন্য যে-বিশ্বাস স্থির করে নিয়েছিলো তা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হাজির করেছে এবং ইতিহাস-বিনির্মাণে কেবল জাতির ভূমিকা স্বীকার করেছে, জাতির বীর ও নায়কদের ভূমিকা নয়—পতন; অর্থাৎ, কমিউনিজমের এই ভেঙে পড়া এবং চারপাশ থেকে জটিলতায় আচ্ছন্ন হওয়া ঘোষণা করছে যে,—আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত—আফগানিস্তানের ভূমিতে লাল ফৌজ যে-সর্বনাশা পরাজয়ের শিকার হয়েছে, তার পর রুশ সাম্রাজ্যবাদের কফিনে অচিরকালের মধ্যেই শেষ পেরেকটি ঠুকা হবে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ () بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورة الروم)

'আর সেই দিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।'[৭]

—ড. আবু মুজাহিদ

[৭] সূরা রুম : আয়াত ৪-৫।

লেখকের কথা

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম
[বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।]
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
[শুরু করছি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে]
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ () وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

"তারপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, মুসা বললো, তোমরা যা এনেছো তা যাদু, নিশ্চয় আল্লাহ তা অসার করে দেবেন। আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সফল করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।"[৮]

আল্লাহর বিধান যেসব মতাদর্শের বিপক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, প্রতিরোধ করেছে এবং ব্যর্থ করে দিয়েছে।

মহান প্রতিপালকের বিধান প্রতিটি ভ্রান্ত মতবাদকে মিটিয়ে দিয়েছে এবং প্রতিটি অসার মতাদর্শকে বাতিল করেছে।

মহান আল্লাহর অভিপ্রায় হলো, সব ভ্রান্ত মতবাদ নিষ্ফল হবে এবং প্রতিটি নিকৃষ্ট মতাদর্শ মাটির নিচে সমাধিস্থ হবে।

মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে তা তার প্রতিপালকের মূলনীতি ছাড়া অন্যকিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। মানুষের মানস-গঠন যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে তা তার সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত মূল্যবোধ ব্যতীত অন্যকিছুর সঙ্গে খাপ খাবে না। এ-কারণেই মানবজাতির সুখ ও সৌভাগ্য নিশ্চিত করতে মানুষের সব মতাদর্শ ও মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনাদর্শকে পরিত্যাগ করে মানুষকে তার দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

---

[৮] সুরা ইউনুস : আয়াত ৮১-৮২।

ইউরোপীয়ানরা গির্জার অন্ধকার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে এবং ভিন্ন এক ঈশ্বরের খোঁজ করেছে। তারা পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও গণতন্ত্রে সুখ-সৌভাগ্য অনুসন্ধান করেছে এবং তাদের দুর্দশা, হতাশা ও অস্থিরতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজতান্ত্রিক যৌথ মালিকানাবাদে; আসলে তারা পতিত হয় জন্তুজানোয়ারের থাবার আড়ালে এবং ওই থাবা তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

নিজের দুটি শাখা নিয়েই পশ্চিমা সভ্যতার পতন ঘটে; উপযোগবাদী পুঁজিবাদের পাশ্চত্য শাখা এবং নাস্তিক্যবাদী সাম্যবাদের (কমিউনিজম) প্রাচ্যীয় শাখা ।

দুর্ভাগা ও দিশেহারা মানবতা ছোটে জন লক, জন স্টুয়ার্ট মিল, ভলতেয়ার, ও জাঁ-জ্যাক রুশোর সংগীতের পেছনে, তারা মনে করে ওঁদের চিৎকাররাশিতেই আছে মুক্তি; কিন্তু সৌভাগ্যের সন্ধান মেলে না তাদের, তারা সুখ ও স্বস্তি থেকে বঞ্চিত থাকে।

তারপর মানবতা ছুটে যায় কার্ল মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্কি ও স্ট্যালিনের পেছনে পেছনে, ফলে তার দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পায়, ব্যর্থ হয় তার স্বপ্ন এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় তার আত্মপ্রবৃত্তি।

সব মতাদর্শই ব্যর্থ হয়, সব মতবাদই পতিত হয় অন্ধ-গহ্বরে এবং বিফল হয় তাদের যাবতীয় অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা। দৃঢ়মূল থাকে একমাত্র মহান আল্লাহর বিধান; কেবল আল্লাহর বিধানই মানুষের অস্তিত্ব ও সামগ্রিকতা, তাদের দেহ ও আত্মা, তাদের স্নায়ু ও অনুভূতি এবং তাদের চিত্ত ও মস্তিত্বের জন্য সুখ ও স্বস্তি এনে দিতে পারে। পবিত্র কুরআনে যথার্থই বলা হয়েছে—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।'[৯]

এসব কারণেই মহান রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে একমাত্র তাঁর ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শই গ্রহণ করতে হবে। তিনি কাফের ও খ্রিস্টানদের কাছে [মত ও পথ] প্রার্থনার ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন এবং সাহাবিদের বরকতময় কাফেলার মানস-গঠন ও দীক্ষাকে কুরআন ও সুন্নাহর স্বচ্ছ প্রস্রবণে সীমিত রেখেছেন।

---

[৯] সুরা মুলক : আয়াত ১৪।

মহান রাব্বুল আলামিন মুসলমানদের সতর্ক করে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ () وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ () وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহপাককে যথার্থভাবে ভয় করো[১০] এবং তোমারা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু[১১] দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো : তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো। তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।'[১২]

এই আয়াতগুলো পার্থিব জীবন ও আখেরাতে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। যেসব চিন্তা ও মতবাদ পৃথিবীকে দুর্ভাগ্যের পথে টেনে নিয়ে গেছে, তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে; মানবতার ললাটে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, দুর্দশা, ব্যর্থতা ও হতাশার কালিমা লেপ্টে দিয়েছে; জীবনযাপন, মূল্যবোধ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাদের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করেছে, সেসব চিন্তা ও মতবাদ সম্পর্কে যিনি লিখতে চান—এই আয়াতগুলো তাঁর জন্য উত্তম ও উপযোগী ঠিকানা।

---

[১০] যথার্থ ভয় করার ব্যাখ্যায় হাদিসে আছে, আল্লাহর অনুগত হবে, অবাধ্য হবে না; আল্লাহকে স্মরণ করবে, ভুলবে না; আল্লাহর কৃতজ্ঞ হবে, অকৃতজ্ঞ বা কৃতঘ্ন হবে না।

[১১] حبل -এর প্রাথমিক অর্থ রজ্জু। এখানে আল্লাহর রজ্জু অর্থে কুরআন ও ইসলাম।

[১২] সুরা আলে ইমরান': আয়াত ১০২-১০৪।

এই আয়াতগুলো মুসলিম উম্মাহর জন্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে, তারা তাদের জীবনের নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দায়িত্বটি হলো, মানবজাতির নেতৃত্ব প্রদান এবং তাদের লাগাম ধরে ঊর্ধ্ব দিগন্ত ও উচ্চ শিখরের দিকে নিয়ে যাওয়া। মানবজাতির নেতৃত্ব গ্রহণকারী মুসলিম উম্মাহর সঠিক দিক-নির্দেশনার জন্য একজন পথপ্রদর্শক অপরিহার্য এবং তিনিই হলের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের জন্য বিশদ দলিল ও মানচিত্র দরকার এবং সে-দুটি হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এ-দুটিই চূড়ান্ত আশ্রয় ও মুক্তির ঠিকানা। অন্ধকার ছেয়ে এলে এ-দুটিই তাদের আলোকবর্তিকা; কার্যক্রম ও কার্যপ্রণালিতে বিমূঢ়তা দেখা দিলে এবং চিত্ত অস্থির ও সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে এ-দুটিই তাদের স্পষ্ট দিকনির্দেশক ও শিক্ষক।

নেতৃত্ব গ্রহণকারী জাতি কখনো তার কর্তৃত্বমূলক দায়িত্বপালন থেকে দূরে সরে যেতে পারে না। তারা কখনো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে না। তারা মানবজাতির পেছনে পড়ে থেকে মানবসৃষ্ট ময়লা-আবর্জনা কুড়িয়ে সেগুলোকে একত্র করতে পারে না এবং সেগুলোকে তাদের জীবনচলার পথ, তাদের স্বভাব-চরিত্রের বিধান, তাদের মতাদর্শ ও চিন্তার নির্ণায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। ময়লা-আবর্জনাকে তারা রক্তে ও সম্পদের এবং আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধের বিচারক হিসেবে মেনে নিতে পারে না; কারণ, তাতে তাদের ধ্বংস ও বিনাশ, দুর্দশা ও বিপর্যয়।

মহান রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ () بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

‘হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো তবে তারা তোমাদের বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।’[১৩]

---

[১৩] সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৯-১৫০।

যেকোনো পর্যায়ে ইহুদি-খ্রিস্টান ও কাফেরদের আনুগত্য পৃথিবীতে মুসলিম জাতির নেতৃত্বের কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পতন ও বিপর্যয় তরান্বিত করে। তা আত্মিক শূন্যতা ও ভয়াবহ অপূর্ণতা সৃষ্টি করে, যাদের ভেতরে মুসলমানের হৃদয় ও মনোবল আছে তারা সবাই এতে যন্ত্রণা ভোগ করে।

ইমাম বুখারি রহ. তাঁর সহিহ্ হাদিসের গ্রন্থে 'কিতাবুশ শাহাদাত' অধ্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—

يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه و سلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم

"হে মুসলিম জাতি, কীভাবে তোমরা খ্রিস্টানদের কাছে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো, অথচ আল্লাহর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর তোমাদের জন্য যে-কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের আল্লাহপাকের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধান, তোমরা তা পাঠ করো এবং তা অবিমিশ্র। আল্লাহপাক তোমাদের কাছে বিবৃত করেছেন যে, আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন খ্রিস্টানরা তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং তারা নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি ঘটিয়েছে। তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য তারা বলে, "তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" তোমাদের কাছে যে-জ্ঞান এসেছে সে-ব্যাপারে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে কি তিনি তোমাদের নিষেধ করেন নি? সাবধান! আল্লাহর কসম, আমরা তাদের কাউকে কখনোই তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সে-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে দেখি নি।"[১৪]

এই একই অর্থে ইমাম আহমদ রহ. আবদুল্লাহ্ বিন সাবিত থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন—

---

[১৪] সহিহুল বুখারি : হাদিস ২৫৩৯। বিভিন্ন ভাষ্যে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। উদ্ধৃত ভাষ্য ও অন্যান্য ভাষ্য দেখে হাদিসের অনুবাদ করা হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنْ التَّوْرَاةِ أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ فَسُرِّيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظِّي مِنْ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنْ النَّبِيِّينَ

'উমর বিন খাত্তাব রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, "আমি বনু কুরায়যা গোত্রের আমার এক ভাইয়ের কাছে গেলে তিনি আমার জন্য তাওরাতের কিছু মূলকথা লিখে দেন। আমি সেগুলো আপনার সামনে পেশ করবো কি?" তিনি বলেন, "এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা পাল্টে গেলো।" আবদুল্লাহ বিন সাবিত বলেন, "আমি উমরকে বললাম, তুমি কি দেখছো না রাসুলুল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেহারা কেমন হয়েছে?" উমর রা. তখন বললেন, "মহান আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।" এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কষ্ট দূর হয় এবং তিনি বলেন, "যে-সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, মুসাও যদি তোমাদের মধ্যে থাকতেন এবং তোমরা আমাদের ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তোমরা পথভ্রষ্ট হতে। তোমরা আমার উম্মত এবং আমিই তোমাদের নবী।"'[১৫]

আমি এখন মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবো। এটিই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

---

[১৫] মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১৫৮৬৪।

ব্যক্তিপরিচিতি

জন লক

(John Locke, ১৬৩২-১৭০৪) ব্রিটিশ বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি চিরায়ত উদারতাবাদের জনক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত। তাঁর প্রধান অবদান An Essay Concerning Human Understanding বা 'মানবজ্ঞানসংক্রান্ত রচনা' (১৬৯০)। এতে তিনি বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। জন লকের মতে, জগতের সবকিছু মানুষের জানার দরকার নেই; শুধু ততটুকুই জানা দরকার, যতটুকু তার আচরণ ও বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজন। তাঁর মতে, মূলত শ্রমলব্ধ সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। সুতরাং, সরকারের স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। তিনি সরকারের কাজকে তিনভাবে ভাগ করেন : ১. আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত (Legislative); ২. প্রসাশন-সংক্রান্ত (Administrative) এবং ৩. ফেডারেল বিষয়-সংক্রান্ত (Federative)। ১৬৮৮ সালে বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে তাঁর মতবাদ কার্যকর হয়। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তী শতাব্দী ধরে চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করে। 'বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থা যদি ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ না দেয়, তা হলে জনগণেরই উচিত সেই ব্যবস্থাকে পাল্টে দেয়া'— তাঁর এই মতবাদকে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া বিপ্লবের যুক্তি হিসেবে হাজির করেছিলো।

জন স্টুয়ার্ট মিল

(John Stuart Mill, ২০ মে, ১৮০৬- ৮ মে, ১৮৭৩) ব্রিটিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও মানবতাবাদী। সামাজিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক তত্ত্ব ও রাজনৈতিক অর্থনীতি-তত্ত্বে তাঁর অবদান অসামান্য। জন স্টুয়ার্ট মিল ১৮৩৩-১৮৫৬ সালে লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। ১৮৪৩ সালে তার A System of Logic বা 'তর্কশাস্ত্রের প্রক্রিয়া' এবং Principles of Political Economy বা 'রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতিমালা' নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়। নির্যাতিত মানবতার প্রতি সহানুভূতিই ছিলো তাঁর তত্ত্বের মর্মবস্তু। অবাধ স্বাধীনতা (Laissez-Faire)-র অপব্যবহার যাতে করা না হয়, তার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় হস্ত ক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেও

পরিচয় দিতেন। ১৮৫৯ সালে তাঁর On Liberty বা 'স্বাধীনতা প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫-৬৭ সালে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন। প্রত্যেক ভোটদাতারই পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার আছে এই যুক্তিতে ১৮৬৭ সালে তিনি পার্লামেন্টে নারীসমাজের ভোটাধিকারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ব্রিটিশদের কাছে এটি ছিলো এক অভিনব প্রস্তাব। তাঁর প্রস্তাব ৭৩-১৯৬ ভোটে নাকচ হয়। তারপর ১৮৬৯ সালে তিনি নারী অধিকারের সপক্ষে The Subjection of Women (নারীদের পরাধীনতা) গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তিনি বছরের একটা অংশ ফ্রান্সে কাটাতেন। ফলে ফরাসি ঐতিহ্যের দ্বারাও তার চিন্তাধারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলো।

ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে ভলতেয়ার

François-Marie Arouet de Voltaire (২১ নভেম্বর, ১৭৯৪- ৩০ মে, ১৭৭৮) ফরাসি লেখক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। সামন্তবাদবিরোধী ব্যাঙ্গরচনার অপরাধে তিনি দুবার ১৭১৭ ও ১৭২৫ সালে গ্রেফতার হন। ভলতেয়ার ছিলেন দ্বৈতবাদী। একদিকে তিনি নিউটনীয় মেকানিক্স ও পদার্থবিদ্যার সমর্থক ছিলেন আর অপরদিকে মূলকারণস্বরূপ স্রষ্টায় বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে স্রষ্টাকে এক করে দেখতে চাইতেন। আত্মার আলাদা সত্তায় তাঁর বিশ্বাস ছিলো না। চেতনাকে তিনি জীবন্ত বস্তুর অন্ত র্নিহিত গুণ বলে চিহ্নিত করতেন। তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশ্বাস করতেন, নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে বিবেচনা করতেন এবং জন লক-এর বস্তুবাদের অনুসরণ করতেন। একইসঙ্গে তিনি 'চূড়ান্ত কারণ' ও 'মহাবিশ্বের স্থপতি'তেও বিশ্বাস করতেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি ছিলেন সামন্তবাদবিরোধী। তিনি ছিলেন আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, সম্পত্তির কর, বক্তব্যের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানা ও সম্পত্তির সমর্থক ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ অবশ্যম্ভাবীরূপে ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত হতে বাধ্য। ভলতেয়ারের মতে সবচেয়ে যৌক্তিক রাষ্ট্র হলো শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, যার প্রধান হবেন একজন বিচক্ষণ রাজা। শেষ জীবনে তিনি প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ব্যাঙ্গরচনার প্রতিপাদ্য ছিলো খ্রিস্টান ধর্ম ও ক্যাথলিক গির্জা। কারণ এগুলোকে তিনি সমাজপ্রগতির

প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। তিনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতেন; কিন্তু সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস করতেন না। ভলতেয়ার ছিলেন পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দর্শনের অন্যতম স্থপতি।

জঁ-জাক রুশো

Jean-Jacques Rousseau (২৮ জুন, ১৭১২- ২ জুলাই, ১৭৭৮) ফরাসি দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও শিল্পজ্ঞ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাশাপাশি তিনি অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। বস্তু ও আত্মাকে তিনি দুই শাশ্বত সূত্র বলে বিবেচনা করতেন। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদে বিশ্বাস করতেন। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি সামন্তবাদী শ্রেণি ও স্বৈরাচারী শাসনের প্রচণ্ড সামালোচক ছিলেন এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র, গণঅধিকার ও জন্মগত অবস্থান নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের সমর্থক ছিলেন। বৈষম্যের কারণ হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে দায়ি করলেও ক্ষুদ্র মালিকানার সমর্থক ছিলেন। রুশো ছিলেন 'সামাজিক চুক্তি' (The Social Contract) মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর মতে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক রাষ্ট্রে পরস্পরের হানাহানি লোপ পেয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। সামন্তবাদী শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থাটা এমন হওয়া উচিত যাতে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জন্মায়। বস্তুত, তিনি ছিলেন পেটি বুর্জোয়া মতবাদের অন্যতম উদ্‌গাতা এবং তাঁর আদর্শে ছিলো 'সৎ হস্তশিল্পী'দের প্রাধান্য। রুশোর রচনাবলির মধ্যে The Social Contract, or Principles of Political Right (Du contrat social), ১৭৬২, ছাড়া Confessions of Jean-Jacques Rousseau (Les Confessions), ১৭৭০, Discourse on Political Economy, ১৭৫৫ এবং Émile: or, on Education (Émile, ou de l'éducation), ১৭৬২ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লিয়ন ট্রটস্কি

Leon Trotsky (৭নভেম্বর, ১৮৭৯--২১ আগস্ট, ১৯৪০) রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিনের নিকটতম দুই সহযোগীর অন্যতম। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ট্রট্স্কির সঙ্গে তাঁর তত্ত্বগত ও নেতৃত্বগত মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছে। স্ট্যালিন ট্রট্স্কির চিরস্থায়ী

বিপ্লবতত্ত্বের (theory permanent revolution) ঘোর বিরোধিতা করেন। এই বিরোধের পরিণামে ১৯২৭ সালে ট্রট্স্কিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯২৯ সালে তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ট্রট্স্কি মেক্সিকোতে অবস্থানকালে ১৯৪০ সালে গুপ্তঘাতকের হাতুড়ির আঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন। স্ট্যালিনের বিরোধীগণ মনে করেন ট্রট্স্কির এরূপ মৃত্যুর পেছনে স্ট্যালিনের প্ররোচনা ছিলো। ট্রট্স্কির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : History of the Russian Revolution; The Permanent Revolution; The Revolution Betrayed; My Life, (Trotsky's autobiography); The Stalin School of Falsification।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মার্কসবাদ : আঁতুড়ঘর ও পরিবেশ-পৃথিবী

প্রয়োগ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে 'কমিউনিজম' শব্দটিকে কার্ল মার্কসের মতাদর্শের ওপর আরোপ করতে মানুষ অভ্যস্ত। কারণ, মার্কস দাবি করেছেন, প্রতিটি বস্তুকে সাম্য বা যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে বৈধতা প্রদানের প্রশ্নে তাঁর মতাদর্শ চূড়ান্ত। কিন্তু যাঁরা তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাস করেন তাঁরা সবাই এটিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) নামে আখ্যায়িত করেছেন। [দেখুন : আফয়ুনুশ্ শুউব, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, পৃষ্ঠা ৭৩]

এই চিন্তা ও মতাদর্শ কীভাবে ছড়িয়ে পড়লো?

উনিশ শতকে ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল যা-কিছু ধর্মের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং যা-কিছু অদৃশ্য-চিন্তার বিরোধী তার সব গ্রহণ করেছিলো। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় তখন উৎপীড়ক গির্জার বন্ধন ছিন্ন করতে এক গভীর প্রতিহিংসাময় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো।

ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় ইউরোপীয়ান সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে 'মানুষের বিরুদ্ধে দেবতাদের শত্রুতা'র উত্তরাধিকার অর্জন করে। শিল্প ও জ্ঞানের দেবতা প্রমিথিউসের কল্পকাহিনি এ-ক্ষেত্রে বেশ বড়ো ভূমিকা পালন করে। প্রমিথিউস মানুষকে জ্ঞান দান করেন। এতে দেবরাজ জিউস অথবা জুপিটার তাঁর প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হন। তাঁকে দেবতাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করে এক নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রাখেন। প্রতিদিন দিনের বেলায় পাখি এসে প্রমিথিউসের কলজে ও মাংস ঠুকরে ঠুকরে খায়। রাতের বেলা আবার নতুন করে কলজে ও মাংস সৃষ্টি হয়। পরের দিন আবার পাখি এসে ঠুকরে ঠুকরে খায়। এভাবে শাস্তি চলতে থাকে। এই কল্পকাহিনি ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়কে বেশ নাড়া দেয়। এই কাহিনির ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে অনেক অনেক গল্প-উপন্যাস ও নাটক তৈরি হয় এবং এগুলো নৃশংস ও উৎপীড়ক দেবতাদের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে অসহায়-পীড়িত মানুষের (পক্ষে সমর্থন উচ্চারণ করে) পাশে দাঁড়ায়।

মধ্যযুগে 'ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের দ্বন্দ্ব!'কে কেন্দ্রীভূত করতে গির্জাগুলো এগিয়ে আসে। তারা বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের বিরুদ্ধে তদন্ত-আদালত[১৬] প্রতিষ্ঠা করে। কল্পকাহিনিতে ভরপুর বই প্রকাশ করে এবং বইটির নাম দেয় খ্রিস্টীয়ান ভূগোল (Geography of Christianity). যাঁরা এই বইয়ের বিরোধিতা করেন তাঁদের সবাইকে তদন্ত-আদালত ধর্ম-অস্বীকারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং শাস্তি দেয়। গির্জার তত্ত্বাবধানে তারা তিন লাখ মানুষকে হত্যা করে এবং বত্রিশ হাজার মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। যাঁদেরকে পুড়িয়ে মারা হয় তাঁদের একজন হলেন ব্রুনো। [দেখুন : মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি; খাসায়িসু আত-তাসাওউরিল ইসলামি, সাইয়িদ কুতুব; ফাসলুল ইজাবিয়্যা ওয়া তাহাফুতুল আলমানিয়্যা, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল, পৃষ্ঠা ৮৮; আস-সিরাত্তু বাইনাল ইলমি ওয়াল ফালসাফা, ড. তাওফিক আত-তাবিল, পৃষ্ঠা ১৯৩; মুহাকিমুত তাফতিশ, আলি মাযহার, পৃষ্ঠা ১০১] ১৫৯৮ সালে[১৭] ব্রুনোকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। কারণ তিনি এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে পৃথিবী পরিক্রমণশীল। একই চিন্তা প্রকাশ করার জন্য কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওকেও শাস্তি দেওয়া হয়।

মার্কস তাঁর ১৮৪১ সালে লিখিত অভিসন্দর্ভে বলেন, 'দর্শন প্রমিথিউসের প্রতীককে পরিগ্রহণ করেছে। আমি যাবতীয় দেবতার বিরুদ্ধে। আকাশ ও পৃথিবীর যতো দেবতা মানুষের মতাদেবতা হওয়ার ক্ষেত্রে তার চেতনা ও প্রতিভাকে অস্বীকার করে, তাদের বিপক্ষে প্রমিথিউসের প্রতীক খুবই চমৎকার। কারণ, দর্শন মানুষের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বানাতে চায় না।' [দেখুন : মার্কসিজম অব টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি, ফরাসি দার্শনিক রোগার গারাউডি, পৃষ্ঠা ১৪৫; আরবিতে অনুবাদ : মার্কসিয়্যাতুল কারনিল ইশরিন, নাযিহ আল-হাকিম]

---

[১৬] the Inquisition : পঞ্চদশ এবং ষোড়ব শতাব্দীতে স্পেনে ধর্মবিরোধীদের দমন করার জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা নিযুক্ত আদালত। এই আদালতকে Holy Office-ও বলা হয়।

[১৭] ব্যক্তিপরিচিতি দেখুন।

ইউরোপের এই বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় গির্জার ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য এক দেবতার খোঁজ করে। গির্জার ঈশ্বরকে তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলো এবং তার থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। ফলে নিজেদের জীবনের বিপুল শূন্যতাকে ঢাকার জন্য তারা ভিন্ন ঈশ্বরের খুঁজে বেরোয়। কী করে তারা? ভাববাদী বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার দুটি শাখার ভিত্তিতে গির্জার ঈশ্বরের পরিবর্তে যুক্তি ও বুদ্ধিকে তাদের প্রার্থিত ঈশ্বর হিসেবে দাঁড় করায়। শাখা দুটি হলো :

১. কল্পরূপে বিশৃঙ্খলা থাকা সত্ত্বেও একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই শাখাটির নেতৃত্ব দিয়েছেন হেগেল। হেগেল একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন; কিন্তু তিনি মনে করতেন মানুষের বৃহৎ বা মুক্ত বুদ্ধিমত্তাই ঈশ্বর। যদিও তিনি বলেছেন, 'বিভিন্ন ধর্ম মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর ছাড়া কিছু নয়। অজগরের খোলস পরিবর্তনের মতো মানুষও তার চিন্তার আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছে।' [দেখুন : মার্কসিজম অব টুয়েনটিথ সেঞ্চুরি, পৃষ্ঠা ১৫৩]

২. দ্বিতীয়টি হলো নাস্তিক্যবাদী শাখা। এটি চূড়ান্তরূপে ঈশ্বরের অস্তি ত্বকে অস্বীকার করেছে। এই শাখার নেতৃত্বে ছিলেন ফিখতে।

এরপর ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় অগুস্ত কোঁৎ-এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রকৃতিকে তাদের ঈশ্বররূপে সাব্যস্ত করে। অগুস্ত কোঁৎ-এর চিন্তারাশির মূলকথা হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টবাদ (Positivism)। অর্থাৎ যা-কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাতে কোনো বিশ্বাস নেই। তিনি মনে করেন, মানুষের চিন্ত ার ক্রমবিকাশ—সমভাবে একক বা শ্রেণির উপস্থিতিতে—তিনটি কালানুক্রমিক স্তরে বিভক্ত। [অগুস্ত কোঁৎ তাঁর দর্শন 'জ্ঞানের (বিকাশের) ইতিহাসে' যে-তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন সে-সম্পর্কে বলেন, 'গ্রিক দর্শনের আগে মানুষের জ্ঞান ছিলো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারপর গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটোর সময়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তারপর অ্যারিস্টটলের সময় জীবন-বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এরপর নতুনভাবে ভিন্ন কালানুক্রম শুরু হয়।' দেখুন : আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস, ড. মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ৩০২]

প্রথম স্তর : ধর্মতাত্ত্বিক—বস্তুর রহস্য ও অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় আল্লাহ বা ঈশ্বরের শারণাপন্ন হওয়া।

দ্বিতীয় স্তর : অধিবিদ্যক[১৮]—আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হয়ে অধিবিদ্যক শক্তির সাহায্যে বস্তুর রহস্য ও জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণয়।

তৃতীয় স্তর : দৃষ্টবাদ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদের নীতিমালার ভিত্তিতে বস্তু ও অস্তিত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন; যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অনুভূতিগম্য নয় তাতে কোনো বিশ্বাস নেই।

ইউরোপীয়ান বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় অগুস্ত কোঁৎ-এর বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে এবং বিশ্বাস করে যে প্রকৃতিও সৃষ্টিজগতের অন্যতম বাস্তবতা। তবে প্রকৃতি সৃষ্টিজগতের ব্যাখ্যা প্রদান করে না। মার্কিন জীববিজ্ঞানী প্রফেসর সেসিল পায়াস হাম্যান বলেছেন, ‘প্রকৃতি সৃষ্টিজগতের কোনো বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান করে না; বরং প্রকৃতি নিজেই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।’[১৯] [দেখুন : আল-ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা, ওয়াহিদুদ্দিন খান]

অগুস্ত কোঁৎ-এর শিষ্য ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ আল্লাহর স্থলে মানুষের অবতরণের কথা বলেন। তিনি দাবি করেন, মনুষ্যত্বই সবচেয়ে বড়ো উপাস্য। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ্ মানুষের কল্পনাজাত। আল্লাহ্ নিজের প্রতিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেন নি; বরং মানুষই সৃষ্টি করেছে আল্লাহকে, তার নিজেরই প্রতিরূপে।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমার প্রথম চিন্তা আল্লাহ, জ্ঞান আমার দ্বিতীয় চিন্তা এবং মানুষ তার বাস্তবতাসহ আমার তৃতীয় ও সর্বশেষ চিন্তা।’ [দেখুন : আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস, ড. মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ২৬৪]

ফ্রিডরিখ নিট্‌শে মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মতো আচ্ছন্ন হয়ে চিৎকার করে স্রষ্টার মৃত্যু ও মানুষের অতিমানব (সুপারম্যান) হওয়ার কথা বলেছেন। [Thus Spoke Zarathustra[২০]]

---

[১৮] অস্তিত্ব, সত্য এবং জ্ঞানের প্রকৃতি বিষয়ক দর্শনের বিশেষ শাখা; অধিবিদ্যা (Metaphysics)। অধিবিদ্যক— অধিবিদ্যাসংক্রান্ত (Metaphysical)।

[19] Nature does not explain, she is herself in need of explanation. (The Evidence of God in an Expounding Universe, page221)

[২০] জার্মান ভাষায় : Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen। নিট্‌শে ১৮৮৩-১৮৮৫ সালের মধ্যে গ্রন্থটি রচনা করেন। ইংরেজি : Thus Spoke Zarathustra : A Book for All and None। এটিকে কেবল Thus Spoke Zarathustra-ও বলা হয়।

কিন্তু ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের যাবতীয় চিন্তা ও চিৎকার গির্জা থেকে পালিয়ে বেড়ানো আতঙ্কগ্রস্তদের আর্তনাদ ছাড়া কিছু নয়; তা কেবল গির্জার দেবতাদের অপচ্ছায়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অনন্ত বিলাপধ্বনি—যে-দেবতাদের অপচ্ছায়া তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিলো, তাদের আশ্রয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলো, তাদের স্বস্তিকে অস্থির উৎকণ্ঠায় পরিণত করেছিলো এবং তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিলো।

এ-কারণেই ইউরোপে নাস্তিক্যবাদ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি; বরং তা ছিলো ইউরোপের মানবমণ্ডলীর ব্যাপারে গির্জার কদর্য কর্মকাণ্ড, ভুল অবস্থান ও নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে এক ধরনের হাতিয়ার; গির্জা বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ এবং মানুষের মানবিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে-হাতাশাব্যঞ্জক ও নির্মম শাস্তি মূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলো তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্র।

ঠিক এই পরিবেশ-পৃথিবীতেই কার্ল মার্কস বেড়ে ওঠেন এবং বিদ্যমান নাস্তি ক্যবাদী চিন্তারাশি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তিনি মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাকে অর্থনীতির গহ্বরে আবদ্ধ করে ফেলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর ইতিহাস আসলে খাদ্য অনুসন্ধানের ইতিহাস। এভাবে তিনি অন্যান্য দৃঢ়ভাবে যুক্ত ও আন্তঃনির্ভরশীল মানবিক অবকাঠামোকে ধূলিসাৎ করে দেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আল-বাহি মনে করেন, [প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের অনুসারী ব্রিটেনের জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং জার্মানির ল্যুডভিগ মাউরার ও ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ একই মত পোষণ করেন।] ইউরোপে ধর্মের সঙ্গে জ্ঞান ও দৃষ্টবাদের দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকভাবে চারটি কালানুক্রমিক স্তর অতিক্রম করে :

১. ঐশী ধারণার কর্তৃত্ব : ক্যাথলিক ধর্মাদর্শ—যেটিকে সেইন্ট পল এবং তারপর সম্রাট কনস্টানটিন বাস্তবরূপ দিয়েছেন।
২. বুদ্ধিবৃত্তির কর্তৃত্ব : ভাববাদী বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা—এই ঘরানার নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রিডলিখ নিট্‌শে ও হেগেল।
৩. দৃষ্টবাদের কর্তৃত্ব : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদী চিন্তাধারা—এই ঘরানার নেতৃত্বে ছিলেন অগুস্ত কোঁৎ। [দেখুন : আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল-ইসতিমারিল গারবিয়্যি , ড. মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ২১০]

৪. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন—প্রধান দার্শনিক কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস।

যে-পরিবেশ-পৃথিবীতে মার্কসবাদের জন্ম হয় ও বেড়ে ওঠে তা ছিলো অদৃষ্টের প্রতি বৈরিতায় আচ্ছন্ন এবং ধর্মের প্রতি ঘৃণাত্মক বৈশিষ্ট্যে আবৃত। এই পরিবেশে যখনই আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে তখনই তাদের মস্তিষ্কে লাফিয়ে উঠেছে ধর্মবাদীদের রূঢ় কুৎসিত চেহারা, কুঞ্চিত ললাট, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-ভরা চোখ, পাপবিদ্ধ সঙ্কীর্ণ বুক, দুর্বল নির্বোধ মস্তিষ্ক। [দেখুন : আল-মুসতাকবিলু লি-হাযাদ্-দীন, সাইয়িদ কুতুব, পৃষ্ঠা ২৫ : মা-যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমিন, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি থেকে উদ্ধৃত]

অধ্যাপক মুহাম্মদ আল-বাহি বলেন, 'এর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানের দ্বন্দ্ব মূলত গির্জার খ্রিস্টবাদের সঙ্গে মানুষের চিন্তার দ্বন্দ্ব। ইউরোপীয়ানদের জীবনে গির্জা যে-দুরবস্থা ও দুর্দশা সৃষ্টি করেছে সেটাই হলো এই দ্বন্দ্বের প্রধান উৎস। [দেখুন : আল-আকিদা ও আসারুহা ফি বিনায়িল জাইলি, পৃষ্ঠা ৩৫ : আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৫৯।]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইউরোপে উৎপন্ন বস্তুবাদী বৃক্ষের একটি শাখা হলো মার্কসবাদ; এটি গির্জা-রোপিত বৃক্ষের টুঁটি চেপে ধরেছে এবং তারপর মূলোৎপাটন করেছে; বরং এটি গির্জার শবাধারে বিদ্ধ বড়ো কীলকগুলোর অন্যতম।

ব্যক্তিপরিচিতি

প্রমিথিউস

গ্রিক পুরাণের মানবপ্রেমিক টাইটান (গ্রিক দেববংশ ও মানবজাতির পূর্বপুরুষ)। দেবতা ও টাইটানেরা তাঁকে দূরদর্শী প্রমিথিউস নামে ডাকতেন। প্রমিথিউস সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; কিন্তু দেবরাজ জিউস তাঁকে হিংসা করতেন। দূরদর্শী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রমিথিউস জানতে পারেন দেবরাজ জিউস পৃথিবী থেকে মানবজাতিকে নির্মূল করে সেখানে অন্য জীব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। তিনি মানবজাতিকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এবং তাদের সাবলম্বী করে তোলার জন্য গ্রিক ও রোমান পুরাণের সবচেয়ে সুদর্শন দেবতা আপোল্লোন্ (ইংরেজিতে এ্যাপোলো)-এর স্বর্গের অগ্নিরথ থেকে আগুন চুরি করে নিয়ে মানুষকে দিয়ে আসেন এবং আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। আগুনের ব্যবহার শিক্ষার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। এতে জিউস প্রমিথিউসের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেন। শাস্তির বিধান অনুযায়ী প্রমিথিউসকে ককেশাসের নির্জন চূড়ায় শক্ত শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং প্রতিদিন জিউসের ঈগল এসে তাঁর যকৃৎ ছিঁড়ে খায়। সারাদিন এই যন্ত্রণাভোগের পর রাতের বেলা আবার নতুন যকৃৎ সৃষ্টি হতো। পরের দিন আবার জিউসের ঈগল এসে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া শুরু করতো। এভাবে কয়েকশো বছর চলার পর গ্রিক পুরাণের শ্রেষ্ঠ বীর হার্কিউলিস জিউসের ঈগলকে বধ করে প্রমিথিউসকে ব্রজশৃঙ্খলমুক্ত করেন। প্রমিথিউসের কাহিনি নিয়ে ঈস্কাইলাসের বিখ্যাত নাটক 'বন্দি প্রমিউথিস' এবং ইংরেজ কবি শেলির কাব্যনাট্য 'Prometheus Unbound' বা 'শৃঙ্খলমুক্ত প্রমিথিউস' রচিত হয়।

গিওর্দানো ব্রুনো

গিওর্দানো ব্রুনো (Giordano Bruno) ১৫৪৮ সালে নেপ্‌লিসের নোলা শহরে (বর্তমানে ইতালি) জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষী ও মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ। তিনি নিখুঁতভাবে নির্ণয় করেন যে সূর্য একটি উজ্জ্বল তারকা ছাড়া কিছু নয় এবং তা নিজ কক্ষপথে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। তিনি দাবি করেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়াও এমন আরো অসংখ্য গ্রহ আছে যেখানে বুদ্ধিমান

প্রাণীরা বসবাস করছে। তাঁর চিন্তা ও মতাদর্শের কারণে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিযুক্ত তদন্ত-আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। ১৬০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। তিনি তিরিশটিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ব্রুনোকে 'বিজ্ঞানের শহীদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus) পৃথিবীকে পরিক্রমণশীল গ্রহ হিসেবে দেখিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের আধুনিক ধারণা প্রবর্তন করেন। জ্যোতির্বিদ্যায় এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এটি এক যুগান্তরকারী ঘটনা। তার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গ্যালিলিও-র দুরবিনসহ পর্যবেক্ষিত সিদ্ধান্তগুলো, কেপলারের গ্রহ-সম্পর্কিত নিয়ম এবং নিউটনের মধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনেক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিলো। কোপার্নিকাস ১৪৭৩ সালে ১৯ শে ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪৩ সালের ২৪ শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই

রেনেসাঁস যুগের ইত্যালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই (Galileo Galilei)-কে আধুনিক পরীক্ষণ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। তিনি ১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইতালির পিসা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।
২০ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'দোলকের নিয়ম' আবিষ্কার করেন। শুরুতে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করলেও শেষে গণিত ও পদার্থবিদ্যাই তাঁর বিষয় হয় এবং ২৫ বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রাচীন গ্রিক আমল থেকেই বদ্ধমূল ধারণা ছিলো—একই উচ্চতা থেকে ফেললে হালকা বস্তুর আগে ভারী বস্তু মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও পড়ার গতির ত্বরণ সম্পর্কে তাঁর নির্ভুল ধারণা থেকে দেখান যে নিচে পড়ার গতি ওজনের ওপর নির্ভর করে না। গ্যালিলিও জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এবং বেশকিছু উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতির

চারটি চাঁদ তিনি আবিষ্কার করেন এবং শনিগ্রহের অদ্ভুত আকৃতিও তিনি প্রথম লক্ষ করেন। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী খ্রিস্টান ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিজের মত প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে এবং বাকি জীবন তাঁকে নিজ বাড়িতে নজরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং ১৬৪২ সালে ৮ই জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ফ্লোরেন্স নগরীতে সমাহিত হন।

হেগেল

ভাববাদী র্জামান দার্শনিক গেওর্গ ভিলহেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)-এর দার্শনিক মত দুইশো বছর ধরে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। পূর্ববর্তী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের দর্শনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে। নীতিশাস্ত্র, ধর্ম, ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব ও রাজানীতি বিষয়ে তাঁর চিন্ত াধারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হেগেল মনে করতেন, ভাব বা অস্তিত্বের মধ্যে অনন্ত কাল ধরে হাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্ব চলছে। তাঁর এই চিন্তা থেকেই আধুনিক কালের দুটি দার্শনিক চিন্তার শুরু। চিন্তা দুটি প্রবলভাবে একে অপরের বিরোধী। তাদের একটি হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদ এবং আরেকটি হচ্ছে নবভাববাদ বা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ। তিনি ১৭৭০ সালের ২৭ শে আগস্ট স্টুটগার্টে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর বার্লিনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফিখতে

জোহান গোতলিব ফিখতে (Johann Gottlieb Fichte) জার্মান ভাববাদী দার্শনিক আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আত্মগত ভাববাদী দার্শনিক। ফিখতে কান্টের বস্তুসত্তার তত্ত্বকে বাতিল করে দেন এবং মনে করেন যে বহির্বিশ্ব পরমভাব, অহম বা আত্মার দ্বারা সৃষ্টি এবং এটিই একমাত্র সক্রিয় সৃষ্টিক্ষম। ফিখতে তাঁর পদ্ধতির ধরন পরিবর্ধন করে কয়েকটি প্রকল্প সূত্রাবদ্ধ করেন, যা দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশের পরবর্তী ধাপে অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ফিখতে মূলত ইমানুয়েল কান্ট ও হেগেলের চিন্তাধারার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে তাঁর দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে তোলেন। Attempt at a Critique of All Revelation, Foundations of the Entire Science of Knowledge,

Foundations of Natural Right তাঁর মৌলিক গ্রন্থ। ফিশতে ১৭৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অগুস্ত কোঁৎ

অগুস্ত কোঁৎ (Auguste Comte) ফরাসি চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানের জনক, প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের প্রবক্তা। ফ্রান্সের মঁপেলিয়ে শহরের এক ক্যাথলিক খ্রিস্টান পরিবারে ১৭৯৮ সালের ১৯ শে জানুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৮১৪ সালে প্যারিসের একোল পলিতেক্‌নিক-এ তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। কিন্তু প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্ব দানের জন্য অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮১৬ সালে বহিষ্কৃত হন। ১৮১৭ সালে ফ্রান্সের সমাজবাদী নেতা স্যাঁসিমঁ-র একান্ত সচিত নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় ১৮২৪ সালে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আধুনিক সমাজভাবনামূলক বক্তৃতাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে প্রত্যক্ষবাদ বা দৃষ্টবাদের ওপর প্রথম বক্তৃতা দেন। এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কুর্ দ্য ফিলসফি পজিতিভ্' ('দ্য কোর্স অব পজিটিভ ফিলসফি', ১৮৩০-৪২) ছয় খণ্ডে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সিস্ত্যাম দ্য পলিতিক্ পজিতিভ্' ('সিস্টেম অব পজিটিভ পলিটি', ১৮৫১-৫৪) চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কোঁৎ-এর মতে ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর নয়, মনুষ্যত্ব। মানবপ্রেমেরে ওপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। চরম অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি গবেষণার কাজ চালান। ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্ল মার্কস এবং মার্কসবাদ

প্রথম আলোচনা : কার্ল মার্কস সম্পর্কিত কিছু কথা

কার্ল হাইনরিখ মার্কস ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে জার্মানির ট্রিয়ের-এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মার্কসের বাবা জীবনের শুরুতে একজন ইহুদি ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো হার্শেল মোর্দেখাই। এরপর তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং নাম পরিবর্তন করে ফেলেন। নিজের নতুন নাম রাখেন হাইনরিখ মার্কস। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হার্শেলের ধর্মান্তর ছিলো মূলত একটি অর্থনীতিক কৌশল, যাতে তিনি খ্রিস্টীয় সমাজে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন, এ-কারণেই মার্কস ধর্ম সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যে ধর্ম হলো মানুষকে প্রতারণার জালে ফেলে অর্থ উপার্জনের উপায় ও কূটকৌশল। এভাবে তিনি ইউরোপের চিন্তার জগতে নতুন চিন্তাধারা সংযোজন করেছিলেন।

কাল মার্কস ইহুদি ধর্মগুরু মার্কস লেভি মোর্দেখাই (১৭৪৩-১৮০৪) এবং ইভা লৌ (১৭৫৩-১৮২৩)-এর নাতি। এ-জন্যে কতিপয় ইতিহাসবিদ এই মত ব্যক্ত করেছেন যে মার্কসবাদ মূলত ইতিহাসের ইহুদিবাদী বিশ্লেষণ এবং জীবন ও মানুষের তাওরাতীয় (বাইবেলীয়) ও তালমুদীয় দর্শন।

[আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও অধিকতর লোভী দেখতে পাবেন।' (সুরা বাকারা : আয়াত ৯৬) আল্লাহপাক তাদের সম্পর্কে আরো বলেছেন, 'আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহপাক অবশ্যই তালুকতে তোমাদের রাজা বানিয়েছেন। তারা বললো, আমাদের ওপর তার রাজত্ব কীভাবে হবে, অথচ রাজত্বের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি এবং তাকে তো প্রচুর ধন-সম্পদ দেওয়া হয় নি।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৭) দ্বিতীয় প্রটোকলে[২১] বলা হয়েছে, 'আমরা চার্লস ডারউইন,

---

[২১] জায়নিস্ট/ইহুদিবাদী নেতাদের প্রটোকলস। ১৯০৫ সালে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কার্ল মার্কস ও নিটশের সফলতাকে তাদের মতবাদের প্রচলনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেছি। তাঁদের জ্ঞান অ-ইহুদিবাদী চিন্তাধারায় যে-চরিত্রবিধ্বংসী প্রভাব সৃষ্টি করেছে তা আমাদের কাছে গুরুত্বের সঙ্গেই প্রতিভাত।']

কার্ল মার্কস তাঁর জীবনের শুরুতে অবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্মানের উপযুক্ত পাত্র তিনিই, যিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। ধর্ম মানব-জীবনের মৌলিক ভিত্তি। ধর্মই আমাদের কল্যাণ ও প্রজ্ঞা শিখিয়ে থাকে।' [দেখুন : আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়ালিদাতুল সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, পৃষ্ঠা ৫২; আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যাহ, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ]

কার্ল মার্কস দরিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠেছেন এবং দরিদ্রতার মধ্যেই গোটা জীবন কাটিয়েছেন। মার্কসের স্ত্রী জেনি ফন ওয়েস্টফ্যালেন (Jenny von Westphalen) তাঁর দারিদ্র্যের বর্ণনা দেন এভাবে : তাঁদের কন্যারা যখন মারা যায়[২২], তাঁরা ওদের কাফনেরও ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁরা যে-বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন সে-বাড়ি থেকেও তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ, বাড়ি-ভাড়া পরিশোধ করার সামর্থ্য তাঁদের ছিলো না।[২৩]

কার্ল মার্কস মতবাদ ও দর্শনের অধ্যয়নে এতোটাই প্রবৃত্ত ছিলেন যে তিনি কাজ ও পেশা ঘৃণা করতেন। এটাই তাঁর দরিদ্রতার গোপন কথা। এ-জন্যে তিনি প্রায় পুরোটা জীবন অন্যের পোষ্য হয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন; কারণ, তাঁর পেশা ছিলো না, অফিস ছিলো না এবং নিয়মতান্ত্রিক কোনো কাজ ছিলো না।

প্রথমে তিনি তাঁর দরিদ্র পিতার সম্পদের ওপর নির্ভরশীল থেকে জীবনধারণ করেছেন। এ-জন্যে একবার তাঁর পিতা তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন : 'তুমি

---

[২২] মার্কস ও ভন ওয়েস্টফ্যালেন দম্পত্তির ছিলো সাত কন্যা সন্তান : জেনি ক্যারোলিন (১৮৪৪-১৯৮৩); জেনি লরা (১৮৪৫-১৯১১); এডগার (১৮৪৭-১৮৫৫); হেনরি এডওয়ার্ড গাই (১৮৪৯-১৮৫০); জেনি এভেলিন ফ্রান্সেস (১৮৫১-১৮৫২); জেনি জুলিয়া এলিনোর (১৮৫৫-১৮৯৮) এবং আরেকটি সন্তান নাম রাখার আগেই ১৮৫৭ সালে মৃত্যুবরণ করে। সাত সন্তানের মধ্যে মাত্র তিনজন পরিণত বয়সে পৌছতে পেরেছিলেন। অভিযোগ করা হয়ে থাকে, মার্কসের গৃহপরিচারিকা হেলেনে ডিমাথের সঙ্গে তাঁর একটি বিবাহবহির্ভূত ছেলে ছিলো। ছেলের নাম ফ্রেডি।

[২৩] কার্ল মার্কসের দরিদ্রতা সম্পর্কে আরো একটি গল্প চালু আছে : তাঁর ছিলো একটিমাত্র প্যান্ট। বসতে বসতে দুই নিতম্বের কাছে প্যান্টটি ছিঁড়ে গিয়েছিলো। ছেঁড়া অংশটিতে তিনি তালি লাগান নি; তাই কোনো অতিথি এলে তিনি দেখা করতে যেতেন না।

একটা স্বার্থপর; তোমার যাবতীয় মানবিক গুণাবলির ওপর স্বার্থপরতা প্রাধান্য পেয়েছে।' যখন তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন, কার্ল মার্কস তাঁর মাকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অংশ চেয়ে একটি চিঠি লেখেন; চিঠিতে তিনি শোক প্রকাশ করে একটি শব্দও লেখেন নি। তিনি পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ শেষ করে তাঁর মা ও ভাইদের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতে শুরু করেন। তাঁর মাকে তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন : 'এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার যে তুমি চিরকাল ছোটো শিশু হিসেবেই জীবনযাপন করবে। এখন তোমার বয়স হয়েছে চব্বিশ বছর; সুতরাং তুমি নিজের ওপর নির্ভরশীল হও।'

কাজের প্রতি ঘৃণা কার্ল মার্কসকে সম্পদ উপার্জনের যে-কোনো উপায় এমনকি কূটকৌশল অবলম্বনে বাধ্য করেছিলো। তিন একজন প্রকাশক, লাস্কির সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চুক্তি করেন। এ-জন্যে তিনি অগ্রিম অর্থ নিয়ে নিলেও পরে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। এভাবে তিনি সমাজতন্ত্রী হারডিঙ্কারের সঙ্গে একই আচরণ করেন। তিনি এই সমাজতন্ত্রীর সঙ্গে একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন এবং অগ্রিম অর্থ নেন; কিন্তু পরে আর গ্রন্থটি তাঁকে দেন নি।

কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দাস ক্যাপিটাল একই সঙ্গে দুটি প্রকাশনী সংস্থায় বিক্রি করেন। তাঁর ছাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁকে একবার লেখেন : 'তুমি আসলে আবেগহীন জড়, স্বার্থপর; মনুষ্যত্ববোধহীন ও অনুভূতিশূন্য।'

কার্ল মার্কস মোসেস হেস-এর ছাত্র ছিলেন। মোসেস হেস একজন ইহুদি এবং Rome and Jerusalem, (১৮৬২) গ্রন্থের লেখক। [এই গ্রন্থটি ছিলো ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক ও স্পষ্ট আহ্বান। এরপর ১৮৯৫ সালে থিওডর হার্জেল এ-বিষয়ে 'ইহুদি রাষ্ট্র'[২৪] গ্রন্থটি রচনা করেন।] মার্কস তাঁর গুরু মোসেস হেস-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। [কার্ল মার্কস—তাঁর শিক্ষক বাকুনিন তাঁর সম্পর্কে এ-কথাই বলেছেন—ছিলেন তাঁর ইহুদি পূর্বপুরুষদের মতো। তিনি দাড়ি কাটতেন না এবং বাবরি রাখতেন, যেনো তিনি হিব্রুভাষী মানুষের একজন পিতৃপুরুষ।] মার্কস বলেন, আমি এই প্রতিভাকে (মোসেস হেস) আমার অনুসরণীয়

---

[২৪] মূল গ্রন্থ : Der Judenstaat (The Jews' State).

ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। কারণ, তিনি ছিলেন সূক্ষ্ম চিন্তায় সজ্জিত একজন মানুষ এবং আমার মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর মতামত ছিলো সঙ্গতিপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করতাম যে তিনি ছিলেন সাংগ্রামী, চিন্তক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৮।

১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (Manifesto of the Communist Party : কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার) প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৬৭ সালে চূড়ান্ত আঙ্গিকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দাস ক্যাপিটাল' প্রণয়ন করেন। [মার্কসের জীবন সম্পর্কে এসব কথা নিচের গ্রন্থগুলোতে দেখুন : আফয়ুনুশ শুউব, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, পৃষ্ঠা ২২-২৭; আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়ালিদাতুল সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, ৫০তম ও পরবর্তী পৃষ্ঠা; হাযিহিশ শুয়ুইয়্যাহ, আবদুল হাফিয মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ২১; মুহাদারাতুল ইসলাম ওয়ান নাযমিল মুআসারা, উশমাবি সুলাইমান, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৮০; আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যাহ, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ।]

মার্কবাদী লেখক ও 'কার্ল মার্কস' গ্রন্থের রচয়িতা ওথর্হল মার্কসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'চিরকালই তিনি ছিলেন অস্থির, বিষাদগ্রস্ত ও বিদ্বেষাপন্ন। বদহজম ও পিত্তে গলযোগের কারণে তাঁর স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সবসময় একটা ঝুঁকি থেকে গিয়েছিলো। তিনি ছিলেন সন্দেহপরায়ণ ও বাতিকগ্রস্ত; দৈহিক উপকরণগ্রহণে অন্যান্য বাতিকগ্রস্তের মতো তিনিও বাড়াবাড়ি করতেন।'

এটা তো একটা জানা ব্যাপার যে মার্কসের দুই মেয়ে আত্মহননের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় আলোচনা : মার্কসীয় মতবাদ

মার্কসীয় মতবাদের চিন্তামূলক মূলনীতিগুলো বিভিন্ন ঘরানার চিন্তাধারা থেকে আহৃত হয়েছে। মার্কবাদের আঁতুড়ঘর ছিলো যে-বৃহৎ চিন্তার জগৎ, তাতে ইতোপূর্বে এ ঘরানাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে হেগেলের বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শবাদী/ভাববাদী চিন্তাধারা এবং অগুস্ত কোঁৎ-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদী/দৃষ্টবাদী চিন্তাধারা।

কার্ল মার্কস মানব-সমাজ ও তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য হেগেল থেকে গ্রহণ করেছেন প্রতিজ্ঞা ও তার বৈপরীত্যের চিন্তা (দ্বন্দ্বতত্ত্ব/দ্বান্দ্বিক চিন্তাসূত্র)।

আল্লাহ তাআলা হেগেলের কাছে হলেন 'পরম ভাব' বা 'চূড়ান্ত কারণ' এবং এটাই হলো প্রতিজ্ঞা বা দাবি। পরম ভাব থেকে উৎসারিত হয়েছে সীমাবদ্ধ ভাব বা বুদ্ধি এবং এটা হলো প্রকৃতি, যা বিপরীত প্রতিজ্ঞা বা বিপরীত দাবি। আলাদা আলাদা প্রকৃতি তাদের সত্তাসহ একত্ব অর্জনের চেষ্টায় নিরত থাকে যাতে নির্বস্তুক/বিমূর্ত ভাবের নিকটবর্তী হতে পারে। বিমূর্ত ভাব (একই সঙ্গে) প্রতিজ্ঞাব্যাপক ও বিপরীত প্রতিজ্ঞা অথবা দাবিব্যাপক ও বিপরীত দাবি।

বিমূর্ত ভাব পরম ভাবের পরমতা এবং প্রাকৃতিক ভাবের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংশ্লেষণ; অর্থাৎ চিন্তা পরম ভাব থেকে পরি সীমাবদ্ধ ভাবে বিতর্তিত হয়, তারপর সীমবদ্ধ ভাব থেকে বিবর্তিত হয় বিমূর্ত ভাবে। [আল-ফিকরুল ইসলামি আল-হাদিস, মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ৩০৮, চতুর্থ মুদ্রণ]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে প্রয়োগ করার জন্য কার্ল মার্কস এই চিন্ত াধারা গ্রহণ করেছেন।

মার্কস বলেছেন, 'ভাব বিদ্যমান, কিন্তু বস্তু ভাবের আগে থেকেই বিদ্যমান; ভাব হলো আয়না, বস্তুর চেহারা তার ওপর প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।' মার্কস আসলে বলতে চেয়েছেন, ভাবের আগেই বস্তু বিরাজমান ছিলো, সুতরাং কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই।—তিনি পবিত্র, মাহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।—বরং তিনি বলেছেন, 'ইলাহ বা মাবুদ, দীন, সৃষ্টি, রাজনীতি ও চিন্তা মূলত ভাবের আয়নায় বস্তুর প্রতিফলন।' (অর্থাৎ, আল্লাহ বা ঈশ্বর মানুষের বস্তুগত কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।)

কার্ল মার্কস মনে করেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই রাজনৈতিক প্রতিভা ও চিন্ত াবিদদের জন্ম দিয়েছে। তার এই মত জোহান গোতলিব ফিখতের মতের বিপরীত। কারণ, তিনি মনে করেন, বড়ো বড়ো ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদরাই ইতিহাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছেন।

এই চিন্তার ওপর ভিত্তি করে মার্কস মনে করেন, বস্তু ও অর্থনীতিতে যে-কোনো মৌলিক পরিবর্তন অন্তর-বিশ্বের পরিবর্তনের দ্বারা অনুসৃত হবে। কারণ, সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষের চিন্তা ও ভাবে বস্তুরই প্রতিফলন ঘটে। সুতরাং আত্মিক উপলব্ধি

এবং মানুষের চিন্তার ও অনুভূতির জগৎ মূলত উৎপাদনযন্ত্রের বিবর্তনের ফল। কারণ, সামাজিক স্তরে বস্তু নিজেকে অর্থনীতিতে প্রকাশ করে থাকে। অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় উপাদান হলো উৎপাদন-ব্যবস্থা বা উৎপাদনের হাতিয়ার। [মার্কস বলেন, বস্তুবাদী জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং চিন্তাগত জীবনের গতিপথকে স্থির করে থাকে। [তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ৯৬; দিরাসাতুন কুরআনিয়্যাহ, সাইয়িদ মুহাম্মদ কুতুব]

মার্কস হেগেলের একই পরিভাষাকে ইতিহাস-বিষয়ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। যেটাকে তিনি শ্রেণি-সংগ্রাম (class struggle) বলেছেন তার ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত ও সন্দেহাতীত বলে গণ্য করেছেন।

১. প্রাচীন নৃপতিদের সমাজ : নৃপতিগণ ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা : প্রতিজ্ঞা (দাবি), দাস-দাসী ও দরিদ্র শ্রেণি : বিপরীত প্রতিজ্ঞা (বিপরীত দাবি)।

   ওই সমাজে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার মধ্যে দ্বন্দের ফলে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে (যেখানে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ ঘটেছে) । তা হলো সামন্তবাদী সমাজ।

২. সামন্তবাদী সমাজ : সামন্তপ্রভু বা জমিদার : প্রতিজ্ঞা (দাবি), কৃষক শ্রেণি ও দাস-দাসী : বিপরীত প্রতিজ্ঞা (বিপরীত দাবি)।

ওই সমাজে দুটি শ্রেণির (কৃষক ও জমিদার) মধ্যে সংঘাতের ফলে উভয় পক্ষের বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে নতুন এক সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। তা পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদী সমাজ গঠনে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ ঘটেছে।

৩. পুঁজিবাদী সমাজ : বুর্জোয়া শ্রেণি (উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক) : প্রতিজ্ঞা (দাবি), প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণি) : বিপরীত প্রতিজ্ঞা (বিপরীত দাবি)। বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে সংগ্রামের ফলে সম্পদ বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণির হাতে এসেছে। তারপর সম্পদ চলে এসেছে রাষ্ট্রের হাতে। এখানে প্রতিজ্ঞা ও বিপরীত প্রতিজ্ঞার সংশ্লেষণ ঘটেছে। এই সমাজই হলো সাম্যবাদী সমাজ।

সাম্যবাদী সমাজে বিপরীত প্রতিজ্ঞার সূত্র স্থির হয়ে থাকবে। মার্কস তাই মনে করেন। কারণ, সম্পদের মালিকার বিলুপ্তি ঘটেছে যা ছিলো

দ্বন্দের/সংগ্রামের কেন্দ্র এবং শ্রেণির-বিভাজনেরও বিলুপ্তি ঘটেছে, যে-কারণে দ্বন্দ্ব/সংগ্রাম অব্যাহত ছিলো।

মার্কসের এই চিন্তাধারার সারসংক্ষেপ করা যায় এভাবে : প্রতিটি সমাজই ধারণ করে আছে তাঁর বিপরীত প্রতিজ্ঞা, যে-বিপরীত প্রতিজ্ঞা ওই সমাজের পতন ঘটাতে পারে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। বিদ্যমান বিপরীত প্রতিজ্ঞা যে-নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে, তাও তার ভাঁজে ভাঁজে ধারণ করবে তার বিপরীত প্রতিজ্ঞা, যে-প্রতিজ্ঞা অচিরকালের মধ্যে তার পতন ঘটাবে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হবে। সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবেই (ভাঙন ও গড়ন) চলতে থাকবে। আর সাম্যবাদী সমাজ কোনো বিপরীত প্রতিজ্ঞা ধারণ করবে না। এ-কারণে সাম্যবাদী সমাজ হবে চিরন্ত ন, নিরবচ্ছিন্ন এবং অবিনশ্বর।

মার্কস মনে করেন, প্রতিটি নতুন সমাজই তার আগের সমাজের চেয়ে ভালো। কারণ, নতুন সমাজ পুরনো সমাজের তুলনায় অগ্রসর। তার কারণ হলো এই, উৎপাদনের নতুন হাতিয়ার উৎপাদনের প্রাচীন হাতিয়ার থেকে উত্তম। সুতরাং এমনভাবে তার সমাজ-ব্যবস্থাও পূর্বের সমাজ-ব্যবস্থা থেকে ভালো। এটাই হলো প্রতারণাময় বিজলিচমক, যার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা তাদের অন্ধ অনুসারীদের চোখ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ-কারণেই আমরা দেখি, কমিউনিস্টরা যেখানেই অবস্থান তৈরি করে সেখানেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নৈরাজ্য ও বিপ্লব সৃষ্টি করে, যাতে তারা বিদ্যমান সমাজের পতন ঘটিয়ে তার জায়গায় নতুন প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টি করতে পারে।

উৎপাদনের হাতিয়ার বা উৎপাদনযন্ত্রের বিবর্তনের ফলে মানব-চরিত্রের যে-বিবর্তন ঘটে, কার্ল মার্কস তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রাচীন সমাজে (শিকার-সমাজ) কেবল পুরুষই সম্পদ অর্জন করতে পারতো। নারী শিকার করতে পারতো না, (ফলে সম্পদও অর্জন করতে পারতো না)। তাই সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান ছিলো তুচ্ছ ও অসম্মানজনক। এরপর সামান্তবাদী সমাজের সূচনা হলো। এই সমাজে নারী সীমিত আকারে হলেও কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলো। ফলে তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলো। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজে অধিকাংশ কাজই পুরুষের পেশির ওপর নির্ভরশীল থাকে। এ-কারণে এই সমাজে নারী তার লৈঙ্গিক/যৌন স্বাধীনতা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়; ব্যভিচারের নিষিদ্ধতার বিষয়টি উদ্ভূত হয় এবং একজন নারীর একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা বৈধতা হারায়।

কিন্তু সমাজ যখন পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হলো এবং নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠলো—কারণ, পুঁজিবাদী সমাজে নারী পুরুষের মতোই পরিপূর্ণভাবে উৎপাদনযন্ত্র চালাতে পারে—নারী লৈঙ্গিক/যৌন স্বাধীনতার চর্চা শুরু করলো এবং যৌনতা বৈধতা পেলো, তা আর নিষিদ্ধ বলে গণ্য হলো না।

এখানে আরেকটি সূত্র আছে। মার্কস শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের জন্য এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন। এটা হলো উদ্বৃত্ত-সূত্র : পুঁজির মুনাফা-সূত্র। মার্কস মনে করেন, মুনাফা মূলত শ্রমিকের ঘাম ও রক্তের ফসল।

সূত্র : উদ্বৃত্ত মূল্য : পুঁজির মুনাফা । শ্রমিকের কাজ বা তার উৎপাদন : শ্রমিকের মুজরি / পারিশ্রমিক। দিনের পর দিন শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা এবং অভাব বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে পুঁজিপতিরা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলেছে। পুঁজি হলো জোঁকের মতো, তা শ্রমিকদের রক্ত চুষে নেয় এবং পুঁজিপতিদের দেহ ফাঁপিয়ে তোলে। শ্রমিকদের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে তার আর সীমারেখা থাকবে না। সে-সময় অভাব তাদেরকে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মালিক বুর্জোয়া শ্রেণির বিনাশ ঘটাতে বাধ্য করবে। সে-সময়ই শ্রমিক-সমাজ (সাম্যবাদী) সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্রমিক-বিপ্লব জয়ী হওয়ার পর সমাজকে বুর্জোয়াদের থেকে পবিত্র করার জন্য প্রলেতারিয়েতীয় একনায়কতন্ত্রের (Dictatorship) ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এরপর যে- কোনো মূল্যে প্রলেতারিয়েতীয় একনায়কতন্ত্র অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে। শ্রমিক-পরিষদ সমাজ পরিচালনা করবে, যে-সমাজে পুলিশ থাকবে না, সেনাবাহিনী থাকবে না। বিশ্বের প্রতিটি ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া শ্রেণির বিনাশ ঘটানো এবং গোটা বিশ্বে প্রলেতারিয়েতদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোভাবেই এবং কিছুতেই শ্রমিক-বিপ্লব থামবে না।

মার্কস মনে করেন, এই সংগ্রাম (শ্রেণি-সংগ্রাম) ঐতিহাসিক, অপরিহার্য এবং বাধ্যতামূলক; এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই সংগ্রামই অপরিহার্যভাবে বিশ্বে শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করবে। এরপর সাম্যবাদ (কমিউনিজম) প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতি সবকিছুর মালিক হবে এবং

সমাজে প্রতিটি বস্তু পরিব্যাপ্ত ও বৈধ হবে, যেমন ছিলো প্রাথমিক প্রাচীন সমাজগুলোতে।

মার্কস মনে করেন, প্রলেতারিয়েতদের বিজয়ের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের সব জায়গায় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে হবে। এ-কারণেই বিপ্লবীর জন্য দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও মানবিকতা মানায় না; কমিউনিস্টের সঙ্গেও এসব গুণাবলি একত্র হতে পারে না। মার্কস ও তাঁর শিষ্যরা এটাই বিশ্বাস করেন।

[আমার উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে :

১. আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল-ইসতিমারিল গারবিয়্যি, মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ২০০ থেকে পরবর্তী।

২. আত-তাফসিরুল ইসলামি তিত্-তারিখ, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল।

৩. নাকযু আওহামিল জাদালিয়্যাতিল মাদ্দিয়্যা, মুহাম্মদ সাঈদ রমজান আল-বুতি, পৃষ্ঠা ৭ থেকে পরবর্তী।

৪. খাসায়িসুত তাসাওউরিল ইসলামি, সাইয়িদ কুতুব, 'আল-ইজাবিয়্যাহ' পরিচ্ছেদ।]

কার্ল মার্কস বলেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান থেকে বঞ্চিত মানুষের অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ না হয়ে উপায় নেই। এবং তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য। তাদের বিজয়ের মধ্য দিয়েই বিপ্লব ও শ্রেণি-সংগ্রাম এবং (বৈষম্যমূলক) অন্য যা-কিছু আছে তার অবসান ঘটবে। শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এসব কর্মতৎপরতার প্রেরণা ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের আদর্শ নয়; বরং তা চূড়ান্ত নেতিবাচক আদর্শ...শত্রুতার আদর্শ। [দেখুন : আত-তাফসিরুত তারিখি, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ২১২, নিউ হোপস ফর আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড, বার্ট্রান্ড রাসেল, পৃষ্ঠা ২৮৬ থেকে উদ্ধৃত।]

ব্যক্তিপরিচিতি

মার্কস ও মার্কসবাদ

জার্মান অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও বিপ্লবী মার্কসের (Karl Heinrich Marx) প্রণীত তত্ত্বই পরবর্তীকালে গোটা বিশ্বে মার্কসবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি তাঁর অধিকাংশ তত্ত্ব দাঁড় করান। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিন ও বন শহরে আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে হেগেলের দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ১৮৪১ সালে তিনি দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালে মার্কস 'রাইনিখে সাইটুং' (Rheinische Zeitung /Rhineland News) নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে কঠোর সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি প্রুশিয়ার শাসকদের বিরাগভাজন হন। ১৮৪৩ সালে তারা পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করলে কার্ল মার্কস সপরিবারে প্যারিসে চলে যান। ১৮৪৫ সালে পাড়ি জমান ব্রাসেলসে। ১৮৪৭ সালে চলে আসেন লন্ডনে। ইতোমধ্যে তাঁর ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের এই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত এবং তা আজীবন টিকে ছিলো। ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস যৌথভাবে বিশ্বের শ্রমজীবী ও বিপ্লবীদের জন্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সালে ইউরোপজুড়ে বিপ্লবের সূচনা হলে মার্কস তাঁর দেশের মাটিতে ফিরে আসেন। কিন্তু জার্মান গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তিনি স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে চলে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওখানেই ছিলেন।

১৯৬৪ সালে তিনি 'ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল' বা 'প্রথম আন্তর্জাতিক' গড়ে তোলেন। কিন্তু এই সংগঠনের অন্যতম নেতা মিখাইল বাকুনিনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়ে এটি ভেঙে যায়। ১৮৬৭ সালে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস কাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন যথাক্রমে এঙ্গেলস ও কার্ল কাউট্স্কি।

মার্কসবাদের মূল বক্তব্য হলো, ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও সঙ্কটই ডেকে আনবে তার পতন। পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠবে কমিউনিজম বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্র হচ্ছে শোষণের যন্ত্র। তাই শ্রেণিহীন সমাজ

গড়ে তোলার মাধ্যমেই শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিশোষণের অবসান সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবই সেই নতুন সমাজ গঠনের একামাত্র উপায়। বিপ্লব ছাড়া স্বয়ংক্রিয় সামাজিক পরিবর্তনের পথে এই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

ডারউইন

চার্লস রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তিনি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) মতবাদের প্রবক্তা। ১৮৩১ সালে তিনি এইচএমএস বিগ্‌ল নামক জাহাজে চড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপাঞ্চল ভ্রমণ করেন। এ-সময় তিনি অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং অভিনিবেশসহ প্রকৃতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেন। পরবর্তী সময়ে সংগৃহীত এসব নমুনার বৈশিষ্ট্য দেখে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সংক্ষেপে তাঁর এই তত্ত্বকে 'প্রজাতির উদ্ভবতত্ত্ব' বলা হয়। গ্রন্থটি ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জীবজগতের বিবর্তন এবং নতুন একটি প্রজাতির উদ্ভব কীভাবে ঘটে বা ঘটতে পারে সে-বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেন এবং তার সপক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর না সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিবর্তনবাদের জনক হিসেবে তিনি পরিচিতি পান। চার্লস ডারউইন ১৮০৯ সালে লন্ডনের শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়।

নিটশে

ভাববাদী জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম নিট্‌শে (Friedrich Wilhelm Nietzsche) ১৮৪৪ সালের ১৫ই অক্টোবর জার্মানির প্রুশিয়ার অন্তর্গত রকেন গ্রামের এক প্রোটেস্টান পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন ও লাইপৎগিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধ্রুপদী ভাষাবিদ্যার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ভাষাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের সমস্যাবলিতেও তাঁর আগ্রহ দেখা যায়।

প্রচলিত নৈতিক ধারণা সম্পর্কে নিট্‌শের অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তাঁর দর্শন স্বাতন্ত্র্যবাদী, অতিমানবে বিশ্বাসী, সাম্যবাদের বিরোধী ও খ্রিস্টধর্মের পরিপন্থী। সমাজতন্ত্রে আতঙ্ক, জনগণের প্রতি ঘৃণা, যে-কোনো মূল্যে পুঁজিবাদী সমাজের অনিবার্য বিনাশ প্রতিরোধের প্রয়াস হিসেবে তাঁর মতবাদ চিহ্নিত হয়ে আসছে।

নিট্‌শের দর্শনের মূলকথা হলো, প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে নিরন্তর আত্মরক্ষা ও বাঁচা-মরার সংগ্রাম চলছে। এর ফলে দুর্বলের ওপর সবল ক্ষমতাবিস্তারে আগ্রহবোধ করে। তাই শোষক, শাসিত বা দাস, প্রভু এগুলো প্রকৃতিগত বিষয়। জীবমাত্রেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হলো শোষণ করা আবার বাঁচার সংগ্রামে পরাজিত পক্ষের অনিবার্য নিয়তি হলো দাস হওয়া। পরাজিতের পক্ষে দাসত্ব স্বীকার করার অর্থ হলো বাস্তব সত্যকে মেনে নেওয়া। তিনি বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণিকে বশে রাখতে হলে তাদের মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এবং পুঁজিবাদী প্রভুদের মধ্যে প্রভুত্বের মনোভাব জাগিয়ে রাখতে হবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিশ শতকে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির উত্থানের পেছনে নিট্‌শের দর্শনের প্রভাব ছিলো বলে ধারণা করা হয়। তাঁর রচনাবলিতে কবিত্বময়তা ও আবেগপূর্ণ স্নিগ্ধ মাধুর্যের পাশাপাশি ব্যাধিগ্রস্ত মনের সংবেদনশীলতাও লক্ষণীয়। ‘জরথুস্ত্রের বাণী’, ‘ভালোমন্দের অতীত’, ‘নীতির পরিবর্তন’ এবং ‘খ্রিস্ট-বিরোধী’ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। নিট্‌শে ১৯০০ সালে ২৫ শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

এঙ্গেল্‌স

ফ্রিডরিখ এঙ্গেল্‌স (Friedrich Engels) জার্মান সমাজতন্ত্রী, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। পরবর্তী কালে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে স্বীকৃত। কার্ল মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে মার্কসবাদ হিসেবে পরিচিত বিপ্লবী সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অনন্য।

এঙ্গেল্‌স ১৮২০ সালে ২৮ শে নভেম্বর এক ধনাঢ্য জার্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে যান। পাশাপাশি সাংবাদিকতার কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৮৪৪ সালে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের পরিচয় ঘটে। এই বন্ধুত্ব এক পর্যায়ে কিংবদন্তিতুল্য নিবিড় বন্ধুত্বে রূপ নেয়। ১৮৪৫ সালে এঙ্গেল্‌সের 'দ্য কন্ডিশন অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মার্কস ও তাঁর যৌথ প্রচেষ্টার ফসল 'জার্মান আইডিওলজি (১৮৪৫)। এটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তাঁদের যৌথ মেধার আরেকটি ফসল 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' (১৮৪৮)। এর মধ্য দিয়েই তাঁরা প্রথম ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনে শ্রমিক-শ্রেণির বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা, ধনতন্ত্রবাদের গর্ভ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মের কথা তুলে ধরেন।

সাধারণভাবে এঙ্গেল্‌স কার্ল মার্কসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত হলেও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, বিপ্লব ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হয়। মার্কসীয় চিন্তাধার মূলত মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের যৌথ চিন্তা ও শ্রমের ফসল।

এঙ্গেল্‌সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'এন্টিডুরিং' (Anti-Dühring, Herr Eugen Dühring's Revolution in Science), The Origin of the Family, Private Property and the State এবং Socialism : Utopian and Scientific।

১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট লন্ডনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোসেস হেস

মোসেস হেস (Moses (Moshe) Hess) একজন ইহুদি দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক। তিনি Labor Zionism-এর প্রতিষ্ঠিতা। ১৮১২ সালে জার্মানির বন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Holy History of Mankind (১৮৩৭), European Triarchy (১৮৪১), On the Monetary System (১৮৪৫)।

বাকুনিন

মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ বাকুনিন (১৭১৭-১৭৭৬) ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং পেটিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত চরিত্রের রুশ বিপ্লবী। নৈরাষ্ট্রবাদ বা অ্যানার্কিজম মতবাদের প্রচারক হিসেবেই বাকুনিন বিখ্যাত হন।

বাকুনিনের মতাদর্শে বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গোড়ার দিকে তিনি জার্মান দার্শনিক ফিখতের চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে হেগেলের দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করে। মার্কসবাদের মতে, বাকুনিন হেগেলের দর্শনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার পরিবর্তে তার ভাববাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন।

সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে বাকুনিনের মতবাদ ছিলো এরূপ : মানুষ মূলত দুটি যন্ত্র দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে একটি রাষ্ট্রযন্ত্র আর অপরটি ধর্মযন্ত্র বা অলীক বিধাতার দণ্ড। রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যাচার থেকে মুক্তির আশ্বাসে মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের আশ্রয় নেয়। আসলে ধর্ম ও রাষ্ট্র যুক্তভাবেই মানুষকে শোষণ করে। মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হলো এই উভয় যন্ত্রকে ধ্বংস করা। তাঁর মতে, রাষ্ট্রযন্ত্র বাদে মানুষ স্বাভাবিকভাবে যুথবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে সক্ষম। সে-সমাজে কারোর কোনো শাসন বা খবরদারি থাকবে না। কার্ল মার্কসও প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সমালোচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের কারণে বাকুনিন কার্ল মার্কসের 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর সদস্য ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কবাদী চিন্তার বিরোধিতার কারণে বাকুনিন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' থেকে বহিষ্কৃত হন।

বাকুনিন কৃষক ও ভবঘুরে সর্বহারাকে বিপ্লবের প্রধান শক্তি বলে বিবেচনা করতেন। কৃষক ও ভবঘুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবে এই ছিলো বাকুনিনের বিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বলশেভিক বিপ্লব

প্রথম আলোচনা : বিপ্লবের জন্য রাশিয়াকে নির্বাচন

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইহুদি গোষ্ঠী বলশেভিক বিপ্লব বাস্তবায়ন করার জন্য লেনিনকে বেছে নিয়েছিলো। লেনিন ছিলেন ইহুদি, তাঁর নাম ছিলো হায়াম গোল্ডম্যান।

তিনি আঠরোশো সত্তর সালের ১০ শে এপ্রিল (প্রকৃত তথ্য : ২২ শে এপ্রিল) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইহুদি জার্মান পিতার নাম ইলকোসরোল গোল্ডম্যান এবং তাঁর ইহুদি মায়ের নাম সোফিয়া গোল্ডম্যান।[২৫]

লেনিন পরবর্তী কালে নাম ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্ নামে পরিচিতি পান।

লেনিনের বড়োভাই আলেকজান্দ্র ইলিচ্ উলিয়ানভ্কে[২৬] রাশিয়ার সম্রাট (জার) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ১৮৮১ সালে গুপ্তহত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় (১৮৮৭ সালে)। তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড লেনিনের হৃদয়ে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং তা রুশ জাতি থেকে তাঁর ভাইয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁকে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

লেনিন একাধিকবার নির্বাসিত হন। অবেশেষে সুইজারল্যান্ডে সাতজন ইহুদির সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত বৈঠক হয় এবং এই ইহুদিরা রাশিয়ায় বিপ্লবের নকশা তৈরি করেন। তার একটি পত্রিকা বের করে; পত্রিকাটির নাম 'ইস্ক্রা' বা স্ফুলিঙ্গ। লেনিনের কঠোর ইহুদি সাম্প্রদায়িক স্ত্রী নাতেঝাতা কন্স্টান্টিনোভ্না 'নাদিয়া' ক্রুপ্স্কায়া ইস্ক্রার সম্পাদনা কমিটির সচিব ছিলেন। কুন, লোএব এন্ড কোম্পানির (Kuhn, Loeb & Company) মালিক ইহুদি মিলিয়নার জ্যাকব হেনরি শিফের (Jacob Henry Schiff) পক্ষ থেকে তাদেরকে অঢেল অর্থ দেয়া হয়। এই কোম্পানিটি ছিলো ইহুদি

---

[২৫] লেনিনের পিতার রুশ নাম ছিলো ইলিয়া নিকোলেইভিচ উলিয়ানভ্ (১৮৩১-১৮৮৬) এবং তাঁর মায়ের রুশ নাম ছিলো মারিয়া আলেকজান্দ্রোভ্না উলিয়ানোভা (১৮৩৫-১৯১৬)। মারিয়ার পিতা আলেকজান্দ্র ব্ল্যাঙ্ক ইহুদি ছিলেন। পরে তিনি অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

[২৬] আলেকজান্দ্র ইলিচ্ উলিয়ানভের জন্ম ১৮৬৬ সালের ১২ই এপ্রিল এবং মৃত্যু ১৮৮৭ সালের ২০ শে মে। তিনি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের সদস্য ছিলেন।

ব্যারন হ্যারিশের অনেকগুলো বড়ো কোম্পানির অন্যতম।[২৭] পরে এটিকে জ্যাকব শিফের নেতৃত্বে ছেড়ে দেয়া হয়।

যাঁরা কমিউনিস্ট চিন্তাধারায় বিশ্বাস করতেন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কমিউনিজম ব্রিটেনে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট মেনিফ্যাস্টো প্রকাশিত হওয়ার সবকিছু পাল্টে যায়। ইহুদিরা ব্রিটেনের বড়ো বড়ো পদে অনুপ্রবেশ করে। এ-সময় ইহুদিদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তারা রুশ সম্রাট (জার) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে ১৮৮১ সালে গুপ্তহত্যা করতে সফল হয়। ফলে রুশ জাতি ইহুদিদের হত্যা ও বিতাড়িত করতে উঠে-পড়ে লাগে। তারা ইহুদিদের ওপর বেশ কয়েকটি গণহত্যা চালায়।[২৮] ফলে ইহুদিরা রুশ জাতি থেকে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। জারগণমূলক বলশেভিক বিপ্লব ঘটাতে প্লাটফর্ম তৈরির জন্য ইহুদিদের রাশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরানোর এটাই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাছাড়া আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো :

১. খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাস্পিয়ান সাগরের কাছাকাছি জায়গায় ইহুদিদের একটি জাতিরাষ্ট্র ছিলো। কিন্তু রাশিয়া তাদের জাতিরাষ্ট্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় এবং ইহুদিদের ভূমির একটি বৃহৎ অংশ রাশিয়ার ভূমির সঙ্গে একীভূত করে। এ-কারণে রুশ জাতি ও ইহুদিদের মধ্যে শত্রুতা বেশ পুরনো। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বর্তমান বিশ্বের নয়-দশমাংশ ইহুদি কাস্পিয়ান সাগরতীরের অধিবাসী ছিলো। এ-কারণেই ইহুদিরা ভৌগলিক মানচিত্র কাস্পিয়ান সাগরের জন্য থেকে (الخزر) শব্দটিকে মুছে দিয়েছে এবং তার পরিবর্তে (قزوين) শব্দটি সংযোজন করেছে।[২৯] এমনকি তারা ইউরোপীয় অভিধানগুলো থেকেও (الخزر) শব্দটিকে মুছে দিয়েছে, যাতে বিশ্ব ইহুদিদের উৎসস্থল সম্পর্কে জানতে না পারে। তাছাড়া আরো একটি কারণ হলো, ইহুদিরা যাতে

---

[২৭] কুন, লোএব এন্ড কোম্পানি ছিলো মূলত পৃথিবীর বৃহত্তম লাভজনক বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। আব্রাহাম কুন এবং সলোমোন লোএব ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে জ্যাকব হেনরি শিফের নেতৃত্বে এটি উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর প্রভাবশালী বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্ক হয়ে ওঠে।

[২৮] ধারণা করা হয় এসব গণহত্যায় দুই লাখেরও বেশি রুশ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছে।

[২৯] الخزر ও قزوين দুটি শব্দই কাস্পিয়ানকে বোঝায়।

মানুষের কাছে প্রমাণ করতে পারে তারা ইসরাইলের সন্তান; ফিলিস্তিনে তাদের যে-প্রতিশ্রুত ভূমি ছিলো তা থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো এবং সে-ভূমিতে তাদের ফিরে আসার অধিকার রয়েছে। [এই আলোচনা বিষদভাবে বোঝার জন্য নিম্ন-উল্লিখিত গ্রন্থগুলো দেখুন :

ক. আল-মুখাত্তাতাত আস-সাহয়ুনিয়্যাতুল তালমুদিয়্যাতুল ইয়াহুদিয়্যাহ ফি গাযবিল ফিকরিল ইসলামি, আনোয়ার আল-জুনদি, পৃষ্ঠা ৮০;

খ. আত-তারিখুস সিররিয়্যু লিল-আলাকাতিলশ শুয়ুয়িয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহহাদ আল-গাদেরি;

গ. আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যাহ ফি মাআকিলিল ইসলাম, আবদুল্লাহ আত-তাল, ৪২ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠা, 'কমিউনিস্ট বিপ্লবে ইহুদিদের প্রভাব' অধ্যায়;

ঘ. আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার;

ঙ. Communism and Zionism, Frank Lollar Britton, page 45-46.

চ. Entrance to Israel, Alan Taylor, page 41.]

২. ইহুদিবাদী ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ১৭৮৯ সালে ইহুদিরা ক্যাথলিজমকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এভাবে তারা অর্থডক্সিজমকেও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে।

৩. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাশিয়ায় ইহুদিদের আধিক্য; বলশেভিক বিপ্লবের সময় তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় সাত মিলিয়ন (৬,৬৪৯,০০০)। বিশেষ করে সেন্ট পিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাদ)[৩০] শহরে তাদের আধিক্য বেশি। এই শহর ছিলো রুশ বিপ্লবের আগ্নেয়গিরি।

৪. রাশিয়ার বিপুল বিস্তৃত সীমানা এবং তার খনিজ ও কৃষি সম্পদ।

৫. রুশ জাতির দরিদ্রতা। এ-কারণে অর্থের বিনিময়ে তাদের আত্মাকে কিনে ফেলা সম্ভব হয়েছে।

---

[৩০] সেন্ট পিটার্সবার্গ বাল্টিক সাগরের ফিনল্যান্ড উপসাগরের মুখে নেভা নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। ১৯২৪ সালে তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পেট্রোগ্রাদ এবং ১৯২৪ সালে রাখা হয় লেনিনগ্রাদ। ১৯৯১ সালে তা আবার সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে ফিরে আসে।

৬. জারদের অত্যাচার এবং তাদের বিপথগামিতা, অর্থডক্সিজমের কর্তৃত্বপরায়ণতা ও বিকৃতি এবং জারদের অত্যাচারকে বৈধতাদান। বিপ্লব ঘটানোর পাঁচজন বিপুল বিত্তবান ইহুদির (হিপসো, লেভি, জ্যাকব শিফ, রন এবং মনোমার) প্রদত্ত অনুদান এক হাজার মিলিয়ন ডলার। তারা এক দশ লাখ ইহুদিকে প্রস্তুত করে এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়। [আল-মুখাত্তাতাত আস-সাহয়ুনিয়্যাতুল তালমুদিয়্যাতুল ইয়াহুদিয়্যাহ, আনোয়ার আল-জুনদি, পৃষ্ঠা ৩৮;]

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে থিয়োডোর হার্জেল (Theodor Herzl) আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদী সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় সভায় রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটানোর জন্য জোর দেয়া হয়। এটা ছিলো এই সভায় গৃহীত ইহুদিবাদীদের সিদ্ধান্তগুলোর একটি পরিচ্ছেদ।

১৯০৫ সালে ইহুদিরা জারের বিরুদ্ধে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিপ্লব সংঘটিত করে। এই বিপ্লব ব্যর্থ হলেও জারকে বাধ্য করে মানুষকে কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে। শুধু তাই নয়, বহু সংখ্যাক নির্বাসন-দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, রাজনৈতিক কারাবন্দিকে মুক্তি দিতেও জার বাধ্য হন। মুক্তিপ্রাপ্তরা সবাই অবশ্যম্ভাবী সফল বিপ্লব ঘটাবার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিতে রাশিয়া চলে আসে। লিয়ন ট্রট্স্কি (Leon Trotsky)[৩১] এই বিপ্লবকে জাগিয়ে তোলেন এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যান। তিনি ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের একজন প্রধান স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (২৮ শে জুলাই, ১৯১৪-১১ই নভেম্বর, ১৯১৮) বলশেভিক বিপ্লবের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।[৩২] রুশ সেনাবাহিনীতে জারের সম্মিলিত শক্তি ছিলো এক মিলিয়ন বা দশ লাখ সৈনিক। তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার একনিষ্ঠ পাঁচ লাখ সৈনিক ছিলো কেবল জারের। এই সম্মিলিত শক্তি যুদ্ধের সময় ক্ষয়িত হতে শুরু করে। যুদ্ধের প্রথম দশ মাসেই রুশ সাম্রাজ্য বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়, কারণ এই দশমাসে

---

[৩১] লিয়ন ট্রট্স্কি ১৮৭৯ সালের ৭ই নভেম্বর (মতান্তরে ২৬ শে অক্টোবর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম লেভ দেভিদোভিচ্ ব্রনস্টেইন। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী রুশ বিপ্লবী ও নাস্তিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতিবিদ এবং রেড আর্মির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধান। ১৯৪০ সালের ২১ শে আগস্ট তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন।

[৩২] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রশক্তির সঙ্গে ছিলো।

২৮ লাখ সৈনিক নিহত হয়। এর অর্থ হলো প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ৩ লাখ সৈনিক নিহত হয়েছে। [Communism and Zionism, Frank Lollar Britton, page 45-55.] এর ফলে রুশ সাম্রাজ্য আঠারো মিলিয়ন সৈনিক প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়।[৩৩] এই সৈনিকদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষক, রাজনৈতিকভাবে যাঁদের ওপর নির্ভর করা যেতো না। এই কৃষকেরা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের (যেমন : লিয়ন ট্রট্স্কি, লেনিন, লেভ কেমনেভ[৩৪] এবং ইহুদি পিটার্সবার্গ) সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা বলশেভিক বিপ্লবের খুঁটি ছিলেন, তার ইন্ধনে পরিণত হয়েছিলেন এবং অবেশেষে বলশেভিক বিপ্লবের নরকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছেছিলেন।

লেনিন যখন রাশিয়ায় প্রবেশ করেন, তাঁর সঙ্গে ২২৪ জন বলশেভিক বিপ্লবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭০ জনই ছিলেন ইহুদি। লিয়ন ট্রট্স্কি রুশ সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েক হাজার ইহুদি সৈনিক নিয়ে রাশিয়ার সীমানার ভেতরে লেনিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রট্স্কি ইতোপূর্বে যেসব ছাত্র-সংগঠক গড়ে তুলেছিলেন তাদের ওপরও নির্ভর করেছিলেন। তাঁরা ৭ই অক্টোবর[৩৫] বলশেভিক বিপ্লব সংঘটতি করেন এবং রাশিয়া বলশেভিকদের শিকারে পরিণত হয়।

আন্তর্জাতিক ইহুদিসঙ্ঘের বিভিন্ন অংশের নেতৃবৃন্দের কাছে ইহুদিরা নিম্নোক্ত নির্দেশনা-ভাষণ প্রেরণ করে : হে ইহুদি জাতি, আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমরা এখন আশাবাদী যে একদিন আমরা বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করবো। রাশিয়ায় আমরা কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পেরেছি; রুশরা ছিলো আমাদের নেতা, এখন তারা আমাদের দাসে পরিণত হয়েছে। [দেখুন : -শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, পুরনো ফরাসি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত, সংখ্যা ১৬৯, ১৯২০ সাল]

---

[৩৩] প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ সাম্রাজ্যের সৈন্য নিহত হয়েছিলো ১৮,১১,০০০-২২,৫৪,৩৬৯ জন, সামরিক বাহিনীর সরাসরি আক্রমণে সাধারণ মানুষ নিতহ হয়েছিলো ৫,০০,০০০ জন, অন্যান্য কারণে সাধারণ মানুষ মারা গিয়েছিলো ১০,০০,০০০ জন এবং মোট নিহত হয়েছিলো রাশিয়ার মোট জনগোষ্ঠীর ২.১৪% বা ৩৭,৪৯,৩৬৯-৪৯,৫০,০০০ জন।

[৩৪] Lev Kamenev (১৮৮৩-১৯৩৬) সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন।

[৩৫] বলশেভিক বিপ্লব ১৯১৭ সালের ৮ই মার্চ থেকে ৮ই নভেম্বরের মধ্যে, মতান্তরে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ শে অক্টোবরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো।

দ্বিতীয় আলোচনা : বলশেভিক বিপ্লব এবং ইহুদি জাতি

বলশেভিক বিপ্লব মূলত ইহুদিবাদের চিন্তা, পরিকল্পনা, অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন। ইহুদিবাদের দার্শনিক ও চিন্তাগুরু হলে কার্ল মার্কস—ইহুদি ধর্মগুরু মোর্দেখাই মার্কসের প্রৌত্র। লেনিনও তাই। তিনি কার্ল মার্কসের কথাকে বাস্তবতা ও বিপ্লবে রূপ দিয়েছেন এবং তাঁর লেখালেখির মাধ্যমে কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তি জুগিয়েছেন। লেনিনও কার্ল মার্কসের মতো ইহুদি ছিলেন।

পার্থ নগরীর বংশধরদের (ইহুদি টেস্টামেন্টের সন্তান) ১৯৩৯ সালে যে-প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তা ছিলো এমন : 'আমরা অন্যান্য জাতিকে তাদের ধর্মহীনতায় সন্তুষ্ট করে তোলার জন্য তাদের মধ্যে মিথ্যা মুক্তি-বিপ্লবের উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছি। শুধু তাই নয়, বরং তারা এইসব ধর্মের শিক্ষার ঘোষণায় লজ্জাবোধ করে সুখ পাবে। এবং আমরা অনেককেই প্রকাশ্যে তাদের নাস্তিকতা এবং স্রষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার ঘোষণায় তুষ্ট করতে সফল হয়েছি। চার্লস ডারউইনের মতবাদ—বানরের নাতি হওয়া নিয়ে তাদের গর্ব-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি। তারপর আমরা তাদের সামনে এমনসব মতবাদ পরিবেশন করেছি যার বাস্তব গভীরতা তলিয়ে দেখা তাদের জন্য অসম্ভব; যেমন : কমিউনিজম (সাম্যবাদ) এবং নৈরাজ্যবাদ। এসব মতবাদ আমাদের কল্যাণে এবং আমাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকবে।' [মিসরীয় পত্রিকা আল-মুসাব্বির, সংখ্যা ২৬২৯]

আর অর্থসংস্থান পুরোটাই হয়েছে ইহুদিদের মাধ্যমে, যেমন আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি।

নিয়ইয়র্কের পূর্ব এলাকা (ব্রুকলিন এলাকা) ছিলো বিপ্লব-পরিকল্পনার মঞ্চ। লিয়ন ট্রট্স্কি এই মঞ্চে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখনো এই এলাকা বিশ্ব-মানবতা ধ্বংসের জন্য ইহুদিদের পরিকল্পনার প্রধান কেন্দ্র রয়ে গেছে।

বলশেভিক বিপ্লব সংঘটতি হওয়ার প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ইহুদিদের অধিকার রক্ষায় দুই দফাবিশিষ্ট একটি প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় :

১. ইহুদি জাতির প্রতি শত্রুতাকে সর্বচ্চো জাতির প্রতি শত্রুতা বলে গণ্য করা, তার জন্য আইনত দণ্ড প্রদান।

২. ফিলিস্তিনের ভূমিতে একটি জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের অধিকার ইহুদিদের রয়েছে বলে স্বীকৃতি প্রদান। [দেখুন : 'হে বিশ্ব-মুসলিম, এক হও!' এবং 'আত -তারিখুস সিররিয়্যু লিল-আলাকাতিশ শুয়ুয়িয়িয়্যাস সাহয়ুনি, পৃষ্ঠা ৩৩]

বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম রাজনৈতিক দপ্তর :

সাতজন ব্যক্তির মাধ্যমে দপ্তরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাঁদের পাঁচ ছিলেন একই পরিবারের এবং ইহুদি। [দেখুন : আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যাহ ফি মআকিলিল ইসলাম, আবদুল্লাহ আত-তাল, পৃষ্ঠা ৫৫; এবং Secret World Government or The Hidden Hand (1926), Arthur Cherep-Spiridovich, page 23]

তাঁরা হলেন :

১. লেনিন, ইহুদি এবং তাঁর স্ত্রী নাতেঝতা ক্রুপ্স্কায়া ইহুদি;
২. লিয়ন ট্রট্স্কি, ইহুদি;
৩. লেভ কেমনেভ, ইহুদি;
৪. গিওর্গি সোকোলনিকভ (Grigori Sokolnikov), ইহুদি;
৫. ঝিনো নেভ, ইহুদি;
৬. স্ট্যালিন [স্ট্যালিনের শাসনকালে অন্য এক ইহুদির পক্ষ থেকে রাশিয়া পরিচালিত হতো। তিনি হলেন লেনিনের স্ত্রীর সহোদর লাজার কাগানোভিচ্ (Lazar Kaganovich)। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাগানোভিচ্ তাঁর পুত্রকে স্ট্যালিনের একমাত্র কন্যা স্ভেত্লানা আলিলুয়েভার[৩৬] (Svetlana Alliluyeva) সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।] তাঁর (স্ট্যালিনের) এক স্ত্রী ছিলেন ইহুদি, তাঁর নাম রোসা কাগানোভিচ্।
৭. ইয়াবানোভ, তিনি রাশিয়ান এবং ইহুদি ছিলেন না। তিনিই একমাত্র সদস্য যিনি ইহুদি ছিলেন না।

---

[৩৬] স্ভেত্লানার মায়ের নাম নাদেঝদা আলিলুয়েভা।

তৃতীয় আলোচনা : লেনিন যে-রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন তার বিবরণ

বলশেভিক বিপ্লবের এটা ছিলো প্রথম সরকার। (এই সরকারে ইহুদি কর্মকর্তাদের হিসেব/সংখ্যা নিচে উদ্ধৃত করা হলো)

মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ	মোট সংখ্যা	ইহুদির সংখ্যা
মন্ত্রী	২২ জন	১৭ জন
যুদ্ধ-বিষয়ক প্রশাসন	৪৩ জন	৩৪ জন
অভ্যন্তরীণ-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ (স্বরাষ্ট্র)	৬৪ জন	৪৫ জন
বহির্দেশীয়-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ (পররাষ্ট্র)	১৭ জন	১৩ জন
সংবাদ বিভাগ	৪২ জন	৪১ জন
মোট উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা	৫৩২ জন	৪২৫ জন

অর্থাৎ লেনিনের সরকারে ইহুদি কর্মকর্তাদের হার ছিলো শতকরা ৮০ ভাগ। [আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যাহ ফি মাআকিলিল ইসলাম, আবদুল্লাহ আত-তাল, পৃষ্ঠা ৪৫]

লেনিনের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে (The Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union) ইহুদি সদস্যের সংখ্যা :

সাল	মোট সংখ্যা	ইহুদির সংখ্যা
১৯২০	৪৫৭ জন	৩২২ জন
১৯২১	৫৫০ জন	৪৪৮ জন
১৯২২	৫২৫ জন	৪৪৫ জন

[দেখুন : হাযিহিশ শুয়ুয়িয়্যাহ ফিল আলামিল আরাবি, আবদুল হাফিয মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৯৪]

স্ট্যালিনের সময়ে ইহুদি সদস্যের সংখ্যা :

মোট সংখ্যা	ইহুদির সংখ্যা
৫৯	৫৬

[দেখুন : Secret World Government, Arthur Cherep-Spiridovich, page 33]

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা হয়তো ভাবছেন ইহুদিদের এই সংখ্যা রুশ বিপ্লবের শুরুর দিকে ছিলো; কিন্তু তা নয়। আমাদের এই সময় পর্যন্তও তাদের প্রভাব অব্যাহত আছে। ১৯৬৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন নারী লেখক, নিনা আলেক্সিভা লিখেছেন : 'সোভিয়েত ইউনিয়নে

ইহুদিদের সংখ্যা শতকরা একজনও বাড়ে নি; কিন্তু তারা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে শতকরা ষাটজনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পার্টি এবং পররাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে আদর্শিক নির্দেশনায় দায়িত্বগ্রহণে তারা শতকরা আশিজনের ভূমিকা পালন করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং ইকোনোমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইহুদি।' [দেখুন : আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার]

ফ্রান্সের দৈনিক সান্ধ্যকালীন পত্রিকা লা মঁদ (Le Monde) ১৯৭১ সালের ২০ শে এপ্রিল সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র শক্তির নেতৃত্বের কৌশলগত নেতৃত্ব ইহুদিদের হাতে রয়েছে।'

এখনো পর্যন্ত ইসরাইল তার ৬০ ভাগ কৃষিজাত পণ্য, ৪০ ভাগ রসায়নিক পণ্য এবং পঞ্চাশ ভাগ অন্যান্য উৎপাদিত পণ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং পূর্ব-ইউরোপে বিশেষ করে যুগোস্লাভিয়ায় রপ্তানি করে থাকে।

প্রবঞ্চনাগ্রস্ত কিছু মানুষ ভেবে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব বিশ্বকে যেসব অস্ত্র প্রদান করে তা বোধ হয় ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। এটা এমন একটা ভুল যা তাদের স্পষ্ট ভাষণ ও বিবৃতির মাধ্যমেই খণ্ডিত হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালের ২২ শে জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক এটাশে ইসরাইলের দৈনিক পত্রিকা মারিভের (Maariv)[৩৭] রিপোর্টারের কাছে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন, 'আমরা যে আরবদেরর সঙ্গে তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ এবং আরবীয় প্রতিক্রিয়শীলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত থাকি এবং আরব প্রজাতন্ত্রকে যে-অস্ত্র দিই তা কেবল প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। তাদেরকে ওইসব অস্ত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরায় আরব ভূখণ্ডে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতি নিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এটা এক ধরনের পরিপূরক রাজনীতি। বরং তা ইসরাইলের সুরক্ষার জন্য জরুরি। আপনারা এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখুন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইসরাইলের সঙ্গে আছে। আজ ও আগামীতে সে ইসরাইলের শক্তি বৃদ্ধি করবে, যেমন গতকাল ও অতীতে তার শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। আপনার আস্থা রাখুন যে আমরা আরব সমাজতন্ত্রের পরিচর্যা করছি। কারণ

---

[৩৭] হিব্রু ভাষায় মুদ্রিত এই পত্রিকা ইসরাইলের রাজধানী তেল আবিব থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সার্কুলেশন সংখ্যা প্রয় ৯০ হাজার।

তাতেই ইসরাইলের স্বার্থ ও কল্যাণের নিশ্চয়তা রয়েছে। যেমন তাতে আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নেরও কল্যাণ ও স্বার্থের নিশ্চয়তা রয়েছে।' [আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার; আত-তারিখুস সিররিয়্যু লিল-আলাকাতিলশ শুয়ুয়িয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৪২]

কলেজ ডি ফ্রান্সের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক র‍্যামন অ্যারন্ড বলেন, 'এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, কমিউনিস্ট আন্দোলন ইহুদিদের প্রাচীন কল্পকাহিনী ও রূপকথা – যেগুলো ওপর শতাব্দীর ধুলোর স্তূপ জমেছে – খুঁজে বের করার ব্যাপারেই সক্রিয় থেকেছে। এ-থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কমিউনিস্ট আন্দোলন কেবল কাল্পনিক ধাঁধার ভেতরে হারিয়ে যায় নি; বরং বাস্তবতার প্রেক্ষিতেও তা কল্পকাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সেগুলো বিদ্বেষ, আত্মিক ব্যাধি ও নিকৃষ্ট কামপ্রবৃত্তির স্তূপরাশি আড়াল করতে অবগুণ্ঠন হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রলেতারিয়েতদের থেকে যিশুখ্রিষ্টের প্রতীক্ষিত নির্ভেজাল জগৎ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।' [দেখুন : The Opium of the Intellectuals, Raymond Aron, পৃষ্ঠা ১৪]

চতুর্থ আলোচনা : গোটা বিশ্বের কমিউনিস্ট বিপ্লব ছিলো মূলত ইহুদিবাদী

শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ইহুদিদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে অন্যান্য ভূখণ্ডে যে-কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেগুলোও মূলত ইহুদিরাই ঘটিয়েছে।

হাঙ্গেরি :

হাঙ্গেরিতে ১৯১৯ সালে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন Béla Kun। তাঁর মূল নাম ছিলো হারুন কোহেন বা Béla Kohn।[৩৮] বেলা কুনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাঙ্গেরিকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। বেলা কুন হাঙ্গেরির ধনসম্পদ ও মানবসম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তিনি উন্মুক্ত সড়কে সুন্দরী তরুণীদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন

---

[৩৮] বেলা কুন (১৮৮৬-১৯৩৮)-এর বাবা ছিলেন ইহুদি এবং মা ছিলেন প্রোটেস্টান খ্রিস্টান। তিনি যে-সন্ত্রাস ঘটিয়েছিলেন তা Great Terror নামে পরিচিত।

এবং তাদের নগ্ন করে তাঁর সৈনিকদের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। সৈনিকেরা তরুণীদের ভোগ করার পর তাদের হত্যা করেছিলো এবং তাদের মৃতদেহ দানইউব নদীতে নিক্ষেপ করেছিলো। ১৯৪৫ সালে হাঙ্গেরি দ্বিতীয়বার কমিউনিস্টদের হাতে পড়ে এবং Mátyás Rákosi হাঙ্গেরির ক্ষমতা দখল করেন। রাকোঝির বন্ধু স্ট্যালিন তাঁকে হাঙ্গেরিতে পাঠিয়েছিলেন। রাকোঝি ছিলেন ইহুদি। পঞ্চাশের দশকে হাঙ্গেরি তিনজন ইহুদির অধীনে শাসিত হয় । তাঁরা হলেন : রাকোঝি, ফাস এবং এরনো গেরো (Ernő Gerő)। [দেখুন : আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, পৃষ্ঠা ৮৫; আস-সাহয়ুনিয়্যাহ ওয়াশ্ শুয়ুয়িয়্যাহ, ফ্রাঙ্ক লোলার ব্রিটন; আল-আফআল ইহুদিয়্যাহ ফি মাআকিলিল ইসলাম, আবদুল্লাহ আত-তাল, পৃষ্ঠা ৫০]

যুগোস্লাভিয়া :
যুগোস্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত করেন যোসেফ ব্রোজ টিটো (মার্শাল টিটো)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ইহুদি নেতা মোসা পিজাদের (Moša Pijade) শিষ্য।

রোমানিয়া :
রোমানিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটতি করেন এবং অস্থিরমতি ইহুদি নারী আনা পোকার (Ana Pauker) । তাঁর কসাই বাবা এবং তাঁর ভাই এখন ইসরাইলে বসবাস করেন।

বলোঙ্গা[৩৯] :
এখানে শক্তির প্রাণকেন্দ্র হলেন তিনজন ইহুদি : মিনক, মায়েভস্কি এবং বুরম্যান।

চেকোস্লোভাকিয়া :
এখানে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত করেন রাডল্ফ্ স্লানস্কি (Rudolf Slánský)[৪০]।

---

[৩৯] ইতালির এমিলিয়া-রোমাগনা অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো শহর।
[৪০] রাডল্ফ্ স্লানস্কি (১৯০১-১৯৫২) চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন।

ব্যক্তিপরিচিতি

লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব

লেনিন রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নেতা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭০ সালের ২২ শে এপ্রিল সিম্‌বির্স্ক অঞ্চলে তাঁর জন্ম। আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্। লেনিন (Lenin) তাঁর ছদ্মনাম।

কিশোর বয়স থেকেই লেনিন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেন। রুশ সম্রাট বা জারকে হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো তার বড়ো ভাইয়ের। এই ঘটনাই তাঁকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৯১ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০০ সালে দেশের বাইরে থাকার সময় তিনি 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৩ সালে তৎকালীন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে জার বিরোধী অভ্যুত্থানে জারের পতন না ঘটলেও ১৯১৭ সালের অভ্যুত্থানে জারের পতন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ৯ই নভেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারপ্রধান ছিলেন।

কার্ল্ মার্ক্স এবং ফ্রেড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স্-এর চিন্তার সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যার জন্যে তিনি বিখ্যাত। তাঁর এই চিন্তাই লেনিনবাদ নামে পরিচিত। ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। লেনিনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Development of Capitalism in Russia (১৯১৬); "Left-Wing" Communism: An Infantile Disorder (১৯২০); The State and the Revolution (১৯১৭)।

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার পেত্রোগ্রাৎ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ায় অনুসৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটি ছিলো ২৫ শে অক্টোবর। তাই একে অক্টোবর বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলো লেনিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু বল্‌শেভিক অংশ। এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণি ও সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে। বিপ্লবপরবর্তী সময়কাল ছিলো নানা দিক দিয়ে জটিল। যে-ব্যাপক

সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো তা দেশের ভেতর ও বাহির থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়।
সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বে পরিণত হয়। অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে, রুদ্ধ হয়ে পড়ে চিন্তার স্বাধীন বিকাশ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে-প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলো নানা পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি ও জটিলতার কারণে নব্বইয়ের দশকে এসে তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

স্ট্যালিন

পুরো নাম উওসেফ ভিসারিওনভিচ জুগাশ্‌ভিলি। আমাদের দেশে জোসেফ স্ট্যালিন বা স্তালিন নামে পরিচিত। ১৮৭৯ সালে জর্জিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। রুশ কমিউনিস্ট একনায়ক। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে কর্তৃত্বময় ও প্রভাবশালী নেতা। বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২২ সালের বলশেভিক দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের লেনিনের মৃত্যুর পর কামিনিয়েভ ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে যৌথভাবে লেনিনের স্থলাভিষিক্ত হন। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রৎস্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে ১৯২৭ সালে তিনি পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক হিসেবে স্টালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

র‍্যামন্ড অ্যারন

র‍্যামন্ড অ্যারন (১৪ই মার্চ, ১৯০৫-১৭ নভেম্বর, ১৯৮৩) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাবা ছিলেন স্যাকুলার ও ইহুদি আইনজীবী। র‍্যামন্ড অ্যারন্ডের রচিত গ্রন্থ চল্লিশটিরও বেশি। তিনি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত The Opium of the Intellectual গ্রন্থটির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।

আনা পোকার

আনা পোকার (জন্মনাম হানাহ রবিনসন/ Hannah Rabinsohn) ১৮৯৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি মালদোভার ভাসলুই কাউন্টিতে এক দারিদ্র্যপীড়িত

অর্থোডক্স ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম সারাহ এবং বাবার নামা হার্শ কাফম্যান রবিনসন (Hersh Kaufman Rabinsohn)। বাবা ছিলেন পেশায় কসাই। আনা পোকার রোমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। ১৯৪০-১৯৫০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন রোমানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরব বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন

ইহুদিরা আরব বিশ্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব ও আন্দোলন সংগঠনে এবং কমিউনিস্ট দল গঠনে পৃষ্ঠাপোষকতা ও তত্ত্বাবধান করে। তারা ছিলো এসব কর্মকাণ্ডের নেতা ও পরিকল্পনাকারী।

ফ্রান্সের ইহুদি কমিউনিস্ট সমাজবিজ্ঞানী ও প্রাচ্যবিদ Maxime Rodinson বলেন, আরব বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে, মিসর ও ফিলিস্তিনে কমিউনিস্ট পার্টি ও তাদের সহায়ক সংগঠন সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলোর ছিলো মুষ্টিমেয় অনুসারী। কমিউনিস্ট পার্টি ও সংস্থাগুলোর ছিলো সেসব দেশের বাস্তবতার বিপরীতে। বড়ো ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি না করের সেগুলেরা সমাপ্তি ঘটেছে। [দেখুন : আল-ইনহিদারুল মার্কসি ফিল আলামিল ইসলামি, নাসির আল-আরাবি, পৃষ্ঠা ৪]

নিচের আলোচনায় আমরা আরব দেশগুলোর ইহুদি নেতাদের নাম উল্লেখ করবো।

মিসরে কমিউনিস্ট পার্টি

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এক রুশ ইহুদি, যোসেফ রোজেনবার্গের হাতে কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা ঘটে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কন্যা শারালোত তাঁর সহযাত্রী হন। কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য মস্কো তিনজন ইহুদির সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। এরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসরীয় ইহুদি হেনরি কুরিয়েলকে (Henri Curiel) দায়িত্ব দেয় এবং ব্যাপক অর্থ দিয়ে তাঁকে সহায়তা করে। কুরিয়েল এই অর্থের মাধ্যমে কুরিয়েল ব্যাঙ্ক অব মিসর প্রতিষ্ঠা করেন এবং Democratic Movement for National Liberation[41] প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[৪১] এর আরবি নাম الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني। সংক্ষিপ্তরূপ : حدتو, HADITU।

এরপর ইস্ক্রা নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর অর্থ স্ফুলিঙ্গ। বলশেভিক আন্দোলন সফর হওয়ার আগে লেনিন যখন দেশের বাইরে ছিলেন, তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে ইস্ক্রা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯৪২ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন ইহুদি Hillel Schwartz। পরে তিনি সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন نحو :(نحشم) حزب شيوعي مصري। পরবর্তীকালে সংগঠনটি ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ফর ন্যাশনাল লিবারেশন-এর সঙ্গে একীভূত হয়।

আল-ফাজরুল জাদিদ (Al-Fajr Al-Jadid/الفجر الجديد) নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন দুজন ইহুদি : ইউসুফ দারবিশ (Youssef Darwish) এবং র‍্যামন্ড দোয়েক (Raymond Douek)। পরে সংগঠনটির নাম হয় الديمقراطية الشعبية।

এরপর গঠন করা ইজিপ্টিয়ান কমিউনিস্ট অর্গানইজেশন (المنظمة الشيوعية المصرية)। এটিও প্রতিষ্ঠা করেন দুজন ইহুদি : ওদেতে সলোমোন (Odette Solomon) এবং তাঁর স্ত্রী সিডনি সলোমোন (Sidney Solomon)।

এরপর প্রতিষ্ঠা করা The Egyptian Liberation Organization। এটিও প্রতিষ্ঠা করেন একজন ইহুদি, মারসেল ইসরাইল (Marcel Israel)।

ইরাকে কমিউনিস্ট পার্টি : ইরাকে ইহুদিরাই কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে এবং শুরুর দিকে সব কার্যক্রমে তারাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইরাকি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় মূল ব্যক্তিরা ছিলেন স্যাসন দালাল, নাজি শামিল, সাদিক ইয়াহুয়া এবং ইউসুফ হিযকিল। তারা সবাই ছিলেন ইহুদি।

সিরিয়া ও লেবাননে কমিউনিস্ট পার্টি

ফিলিস্তিন ও মিসরে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর সিরিয়া ও লেবাননে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়। লেবাননে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন জ্যাকব তিবের। তিনি ছিলেন রুশ ইহুদি। তাঁর সহকারী ছিলেন আরো তিনজন ইহুদি : মিক (Mick), ওসকার (Oscar) ও মুলার (Muller)।

এরপর হাইফার পথে তিনজন ইহুদি বয়রুতে প্রবেশ করে। তারা সবাই এসেছিলো রাশিয়া থেকে। তারা ছিলো মূলত মস্কোর গুপ্তচর। ইহুদি তিনজন হলো যোসেফ বার্গার, ইয়াহু পিটার এবং নাখমান লাতভিনস্কি।
সিরিয়া ও লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টি ছিলো ফিলিস্তিনের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী। তারপর তারা ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী হয়ে ওঠে। [দেখুন : আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৪৬; তারিখুল আলাকাতিস সিররিয়্যি বায়নাশ শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়াস সাহয়ুনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৫৯; আল-ইনহিদারুল মার্কসি ফিল আলামিল ইসলামি, নাসির আল-আরাবি, পৃষ্ঠা ৫]

ফিলিস্তিন ও জর্ডানে কমিউনিস্ট পার্টি

ফিলিস্তিন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার বিষয়টি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বলশেভিক বিপ্লবের নেতারা এ-নিয়ে বেশ ব্যস্ত ছিলেন। বলশেভিক বিপ্লব সফল হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে লেনিন দুই দফাবিশিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : এক, ইহুদিদের (সেমিটিক) শত্রু ভাবা আইনত অপরাধ ও দণ্ডনীয়। দুই, ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জোরালো সহায়তা। [দেখুন : ইয়া মুসলিমিল আলাম ইত্তাহিদু; তারিখুল আলাকাতিস সিররিয়্যি বায়নাশ শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়াস সাহয়ুনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৩৩]
লেনিন বলেছেন, ধর্ম জাতির জন্য আফিমতুল্য; কিন্তু নির্বাচিত ইহুদি জাতির কল্যাণে ইহুদি ধর্ম রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এতেই তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। কারণ, ইহুদি ধর্ম ছাড়া ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। [তালমুদি লিটারেচার, পৃষ্ঠা ৯৫]
১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বেলফোর ডিক্লারেশন প্রকাশিত হওয়ার কমপক্ষে বিশদিন আগে লেনিনের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়।
এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টরা ফিলিস্তিনে কমিউনিস্ট সংগঠন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে ফিলিস্তিনে যে-ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয় তা ছিলো ওই এলাকার প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথমে সংগঠনটি দাঁড় করার একজন রুশ ইহুদি, রসটেইন। মস্কো রুশ কমিউনিস্ট পার্টির দুজন ইহুদি গুরুকে ফিলিস্তিনে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে পাঠায়। তাঁরা হলেন জ্যাক হেপেলেভ এবং রাডোল কারেন।

ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টির শুরুর দিকের যাবতীয় কার্যক্রম রসটেইনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিলো।
এরপর মস্কো পাঠায় ভ্লাদিমির ইভগেনিয়েভিচ ঝাবোতিনস্কিকে[৪২]। তিনি ফিলিস্তিনে বেশ উত্তেজনা জাগিয়ে তোলেন। এরপর তারা আরব দেশগুলোতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের জন্য পাঠায় ও. আভারবুখকে, তাঁর উপাধি ছিলো আবু যিয়াম। আভারবুখ সুইজারল্যান্ডে লেনিনের বন্ধু ছিলেন। আভারবুখ ছিলেন ফিলিস্তিনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও মান্য কমিউনিস্ট। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতা ছিলেন।
প্রথমে ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ কেবল ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। পরে তাতে কিছু কিছু ফিলিস্তিনি আরব প্রবেশ করতে শুরু করে। অধিকাংশ কমিউনিস্টের কাছেই তারা বিশ্বস্ত ছিলো না এবং তাদের দুরভিসন্ধির বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য ছিলো না। [দেখুন : আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৪৪, আল-হিযবুশ শুয়ুয়ি ফি সুরিয়া ও লেবানন, আইয়ুব, পৃষ্ঠা ৫৮ থেকে উদ্ধৃত।]

১৯৩৭ সালে হাইফাতে শ্রমিক ইউনিয়নের ছদ্মাবরণে ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গণআন্দোল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়নের সচিব ছিলেন এমিল তোমা। নাসেরায় (ফিলিস্তিনের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ শহর) শ্রমিক ইউনিয়নের সচিব ছিলেন এমিল হাবিবি এবং ইয়াফায় সচিব ছিলেন ফুয়াদ নাসসার।
১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্টরা ন্যাশনাল লিবারেশন লিগ প্রতিষ্ঠা করে। এর সেক্রেটারি ছিলেন একজন ইহুদি, বেন লেভস্কি, তাঁর সহযোগী ছিলেন তাওফিক তওবি। এই লিগের উদ্দেশ্য ছিলো ব্রিটেনকে বিতাড়িত করা এবং তারপর আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যুগ্ম সরকার গঠন করা।

---

[৪২] জন্মনাম Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky, ডাকনাম Ze'ev Jabotinsky । ইহুদিবাদী বিপ্লবী নেতা। সৈনিক, লেখক, কবি, বাগ্মী এবং ইহুদি আত্মরক্ষা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Turkey and the War, (১৯১৭); The Jewish War Front, (১৯৪০); The War and The Jew, (১৯৪২).

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ন্যাশনাল লিবারেশন লিগের সদস্যরা সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দে পরিণত হন। এই গোষ্ঠীগুলো ফিলিস্তিনি জাতিকে জবাই করে। এ-সময় প্রতারিত বোধ করে কিছু যুবক গোষ্ঠীগুলো থেকে বেরিয়ে আসে, কারণ তখন উত্তেজিত কমিউনিস্টরা ইহুদিদের প্রতিরক্ষা করেছিলো এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলো। বেরিয়ে আসা যুবকদের মধ্যে আছেন নাসেরার আইনজীবী ইবরাহিম বকর, [আশ-শুয়ুয়িয়্যা ফিল ওয়াতানিল আরাবি, আবদুল হাফিজ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ২৫] এবং ইয়াফার ফুয়াদ নাসসার। ফিলিস্তিনের অন্য আরব কমিউনিস্ট নেতারাও এভাবে বেরিয়ে এসেছেন।
১৯৪৮ সালে আরবদের পরাজয়ের পর ফিলিস্তিনি ইহুদি কমিউনিস্ট পার্টি ফিলিস্তিনের অদখলকৃত অবশিষ্ট ভূমিতে শ্যেনদৃষ্টি ফেলে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন এমিল তোমা, তাওফিক তওবি এবং এমিল হাবিবি। শেষোক্ত দুজন বর্তমানে ইসরাইলের অ্যাসেম্বলি (পার্লামেন্ট) নেসেটের (Knesset) সদস্য।
ফিলিস্তিনের দুটি অংশের (দখলকৃত এবং দখলমুক্ত) কমিউনিস্টদের মধ্যে সংযোগ ও যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো একটিমাত্র উপায়ে : ইসরাইলি কর্মকর্তা এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রেস সেক্রেটারি ট্রুস কমিশনে কাজ করতেন।
কমিউনিস্ট পার্টির যতো প্রচারপত্র ছিলো সেগুলোর নিচে হিব্রু ভাষায় একটি কথা জুড়ে দেয়া হতো : ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা-দপ্তর কর্তৃক মুদ্রিত। এখানে ফিলিস্তিন বলে ফিলিস্তিনের দখলকৃত অংশ বোঝানো হতো। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭]
১৯৫০ সালে পশ্চিমতীরকে জর্ডানের সঙ্গে একীভূত করা হয়। সমাজতন্ত্রী তালাআত হারবকে[৪৩] রামাল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি তখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারপত্র বিলি করছিলেন। এসব প্রচারপত্র তিনি ইসরাইল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯৫১ সালে শান্তিরক্ষা বাহিনী

---

[৪৩] তালাআত পাশা হারব (২৫ শে নভেম্বর, ১৮৬৭-১৩ই আগস্ট, ১৯৪১) ছিলেন নেতৃস্থানীয় মিসরীয় সমাজতন্ত্রী। The Bank of Egypt এবং এর গ্রুপ অব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা।

আম্মানে কমিউনিস্টদের মুদ্রণযন্ত্রের সন্ধান পায়। তাতে হিব্রু ভাষায় সংখ্যা ও বাক্য উৎকীর্ণ ছিলো।

১৯৫২ সালে ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টি থেকে জর্ডান কমিউনিস্ট পার্টি পৃথকীকরণের ব্যাপারে মস্কো থেকে নির্দেশনা জারি হয়। ফায়িক ওয়াররাদ তখনো ফিলিস্তিনের দখলকৃত অংশেই ছিলেন। ইসরাইলি বাহিনি তাঁকে বেরিয়ে যেতে অনুমতি দেয়; যাতে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এভাবে তিনি ১৯৫৬ সালে জর্ডান হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ রামাল্লা এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। একই সময়ে ইয়াকুব যিয়াদাইন—খ্রিস্টান কমিউনিস্ট—বাইতুল মাকদিস (কুদস) এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। [দেখুন : হাযিহিশ শুয়ুয়িয়্যাহ ফিল আলামিল আরাবি, আবদুল হাফিজ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ২৯] উল্লেখ্য যে, ইয়াকুব যিয়াদাইনের বাড়ি কারাকে; তিনি কুদসের লোক নন। কমিউনিস্টরা তাদের প্রচারণার স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে মিসরের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে সুবিধা ভোগ করে। ব্যালট বাক্সে কিছু কাগজ পাওয়া যায় তাতে লেখা : হে জামাল (আবদুন নাসের), আপনার প্রতি সম্মান জানিয়ে, হে যিয়াদাইন, আপনি গ্রহণ করুন।

১৯৫৭ সালে জর্ডান কমিউনিস্ট পার্টির বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং জাফার বন্দিশালায় তাঁদের অন্তরীণ করে রাখা হয়। জর্ডান কমিউনিস্ট পার্টির সচিব ফুয়াদ নাসসার কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিলো : কমিউনিজম এবং ইসরাইল। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'আমরা জানি এবং সবাই জানে যে ইসরাইল একটি অবধারিত বিষয়; তার রাষ্ট্র, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কাঠামো অপরিহার্য। ইহুদি জাতি অন্যান্য জাতির মতো; তাদেরও জীবনের অধিকার আছে। আমি ইহুদি জাতিকে একটি রাষ্ট্রের মতোই স্বীকার করি। কারণ, চালুনি দিয়ে সূর্যকে ঢাকা যায় না। [দেখুন : হাযিহিশ শুয়ুয়িয়্যাহ ফিল আলামিল আরাবি, আবদুল হাফিজ মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৮৯]

ফুয়াদ নাসসার আম্মানে ১৯৭৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইসরাইল কমিউনিস্ট পার্টি নাসেরায় মৃতের প্রশংসাসূচক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে পার্টির নেতা মায়ার মিলনার বক্তৃতা করেন। এমনিভাবে তাওফিক তওবি, এমিল তোমা এবং ৩০ শে মার্চ ধরিত্রীদিবসের প্রবক্তা তাওফিক যিয়াদও বক্তৃতা করেন। এই তাওফিক যিয়াদ ইসরাইলের অ্যাসেম্বলি

নেসেটের সদস্য। তিনি ১৯৭৮ সালে ইসরাইলি জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমেরিকা থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন।

দুই ফিলিস্তিনি সমাজতন্ত্রী কবি মাহমুদ দারবিশ এবং সামিহ আল-কাসিম—ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূমির দুই প্রতিনিধি—সোফিয়ার (বুলগেরিয়ার রাজধানী) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসরাইলের জ্ঞান সরবরাহ করেন।

উস্তাদ সাদ জুমা বলেন, সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণিত যে ইসরাইল কমিউনিস্ট পার্টি এবং আরবের সব কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একক সংঘ প্রতিষ্ঠা, বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐক্য, একই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। যাঁরা জর্ডানে শাসনযন্ত্রণা ভোগ করেছেনে তাঁরা জানেন আরবের কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ প্রচারপত্র আমাদের কাছে ইসরাইলের পক্ষ থেকে দণ্ড ও সাজার শিক্ষাবাণীই নিয়ে আসতো। জর্ডান কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা নষ্টভ্রষ্ট জায়নিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের হাতে প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা নেওয়ার পর ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে আমাদেরকেই দোষারোপ করেছেন, নিন্দা করেছেন এবং অপবাদ দিয়েছেন। [দেখুন : আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭, আল-মুআমারা ওয়া মারাকাতুল মাসির, সাদ জুমা, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২ থেকে উদ্ধৃত।]

ব্যক্তিপরিচিতি

এমিল তোমা

এমিল তোমা ১৯১৯ সালে হাইফায় এক আরব অর্থোডক্স খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জেরুজালেমের জায়ন কলেজে পড়াশোনা শেষে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এ-বছরই ফিলিস্তিন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তিনি প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল লিবারেশন লিগের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৪ সালে এমিল তোমা, ফুয়াদ নাসসার এবং এমিল হাবিবি মিলে আল-ইত্তিহাদ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ সালের ১৪ই মে এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এখনো পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত আছে। ১৯৬৫ সালে তিনি مسيرة الشعوب العربية ومشاكل الوحدة العربية/The March of the Arab Peoples and the Problems of Arab Unity অভিসন্দর্ভের জন্য মস্কো থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এমিল তোমা রাজনীতি, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে ১৫টি গ্রন্থ এবং একশোরও বেশি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কমিউনিজমের অবস্থান

প্রথম আলোচনা : ধর্মের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য

কমিউনিজম আসলে সব ধর্মের বিরুদ্ধেই একটা যুদ্ধ। এর অগ্রভাবে রয়েছে ইসলাম ধর্ম। তবে ইহুদি ধর্ম, বলশেভিক বিপ্লব তার জন্য কোনো বাধা সৃষ্টি করে নি। লেনিনের যুক্তি ছিলো যে ইহুদিরা একটি নিপীড়িত জাতি; তাদের লুণ্ঠিত অধিকার ফিরে পাবার জন্য তাদের ধর্মের প্রয়োজন আছে।

ধর্মের ব্যাপারে তাদের কিছু বক্তব্য :

১. কার্ল মার্কস বলেছেন, 'ধর্ম জাতির জন্য আফিম। আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করে নি; বরং মানুষই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে।'

২. লেনিন বলেছেন, 'ধর্ম হলো রূপকথা ও অজ্ঞতাবিলাস।' যুবকদের তৃতীয় সম্মেলনে লেনিন বলেছিলেন, 'আমরা কোনো ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমরা ভালোভাবেই জানি যে গির্জার প্রভুরা, সামন্তবাদীরা এবং বুর্জোয়া শ্রেণি কেবল সুবিধাভোগের উদ্দেশ্যেই আমাদের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করে থাকে।'

৩. স্ট্যালিন ১৯৩৭ সালে বলেছেন, 'এটা বোধগম্য হওয়া উচিত যে ধর্ম হলো কল্পকাহিনী, আল্লাহর চিন্তা কুসংস্কার এবং নাস্তিকতাই আমাদের ধর্ম।'

৪. রাশিয়ার রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রাভদা (Pravda) ঘোষণা করেছে, 'আমরা তিনটি বিষয় বিশ্বাস করি : কার্ল মার্কস, লেনিন এবং স্ট্যালিন; এবং তিনটি বিষয় অস্বীকার করি : আল্লাহ, ধর্ম এবং বিশেষ রাজত্ব।' [এই বক্তব্যগুলো জানতে দেখুন : ফাতাওয়া আন আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ, আবদুল হালিম মাহমুদ; হাযিহিশ শুয়ুয়িয়্যাহ ফিল আলামিল আরাবি, আবদুল হাফিজ মুহাম্মদ; আল-ইসলাম ইয়াতাহাদ্দা, ওয়াহিদুদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ৩০; আল-মুখাত্তাতাতুল তালমুদিয়্যাহ, আনওয়ার আল-জুনদি, পৃষ্ঠা ৯৫; মা হুয়াল গারবু, রাশেদ আল-গানুশি, পৃষ্ঠা ৪০]

কমিউনিস্টরা তাদের অতীত নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি জোরদার করার জন্য এখনো পর্যন্ত অব্যাহতভাবে গ্রন্থ ও শব্দকোষ প্রকাশ করে চলছে। ১৯৬৭

সালে মস্কো থেকে দর্শনকোষ প্রকাশিত হয়েছে। এতে সেই একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে : 'ধর্ম জাতির জন্য আফিম।' 'ইসলাম সামাজিক উৎপীড়নকে বৈধতা দিয়েছে, মানুষকে বৈপ্লবিক প্রতিরক্ষা থেকে বাধা প্রদান করেছে এবং তাদেরকে আখেরাতে সৌভাগ্য পেতে নির্বোধ অপেক্ষায় বাধ্য করেছে। [Marxism in the Twentieth Century, Roger Garaudy (১৯৭০), আরবি অনুবাদ : নাযিহ্ আল-হাকিম, পৃষ্ঠা ২৫। উল্লিখিত ভাষ্য অনুবাদকের।]

দ্বিতীয় আলোচনা : সমাজতন্ত্র (কমিউনিজম) গ্রহণকারীর বিধান

সমাজতন্ত্রের উল্লিখিত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এই : প্রত্যেক সমাজতন্ত্রী কাফের, ইসলাম-বহির্ভূত, যদিও সে নিয়মিত বা মাঝে মাঝে নামায আদায় করে। সে মুসলিম নারী বা মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না। যদি সে কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করে তবে এই বিয়ে হবে ব্যভিচার; তাদের সন্তানেরা হবে জারজ সন্তান। সমাজতন্ত্রীর জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। সে মারা গেলে গোসল দেওয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তার জানাযার নামায পড়ানো হবে না এবং মুসলমানদের গোরস্তানে তাকে দাফন করা যাবে না। সমাজতন্ত্রীর মুসলমান সন্তানদের জন্য তার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ বৈধ হবে না।

এমনিভাবে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো সমাজতন্ত্রী মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ হবে না। এই বিয়ে আপনাআপনি বাতিল হবে। তার ঘনিষ্ঠ হওয়া হবে ব্যভিচার। এটাই বর্তমান যুগের সকল আলেমের ফতোয়া। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়েখদের ফতোয়াও এটাই। এসব ফতোয়ার মধ্যে আছে শায়খ হুসাইন মাখলুফ, শায়খ মুহাম্মদ আল-বাখিত এবং শায়খ আবদুল হালিম মাহমুদের ফতোয়া। [ফাতাওয়া আন আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ্, আবদুল হালিম মাহমুদ]

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

রুশ মুসলমানদের জন্য কুরআন মাজিদ রাখা নিষিদ্ধ। কুরআন কী তা তাঁরা দেখেন নি এবং জানেন না। একজন যুবক আমাকে বললেন, 'একজন রুশ মুসলিম জানতে পারলেন যে আমার কাছে এক কপি কুরআন মাজিদ আছে। তিনি ৩৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আমার কাছে কুরআন

মাজিদ দেখতে এলেন। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কুরআন মাজিদ এক খণ্ড নাকি কয়েক খণ্ড?””

তৃতীয় আলোচনা : মুসলমানদের ওপর কমিউনিস্ট কর্তৃক সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ

কমিউনিস্টরা মুসলমানদের ওপর যেসব গণহত্যা চালিয়েছে ইতিহাস তার যুগযুগান্তরে এর কোনো দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে নি। বলশেভিক বিপ্লব সফল করার সময় লেনিন ও স্ট্যালিন ১৯১৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁদের আহ্বানের ভাষা ছিলো এমন : হে মুসলমানগণ, তোমাদের মসজিদ, তোমাদের নামায, তোমাদের ঈদ-উৎসব, তোমাদের আচার-অনুষ্ঠান সবকিছু হবে নিরাপদে; তোমরা এগিয়ে আসো এবং জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সহায়তা করো। তোমাদের মুক্তির সময় চলে এসেছে। [দেখুন : আল-বালাগ, কুয়েত, সংখ্যা ৪৭৮, নভেম্বর, ১৯৭৮] তাঁদের আহ্বানে মুসলমানরাও ধারণা করলো যে এখন তাদের মুক্তির সময় চলে এসেছে। তারা জার থেকে মুক্তি এবং তাদের উৎপীড়নের আগুন থেকে বাঁচার জন্য উড়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তারা দৈত্য ও ড্রাগনের দুই চোয়ালের মধ্যে পড়ে যায় এবং ওরা তাদের আচ্ছামত চিবিয়ে খায়। বা, তারা হিংস্র জন্তুজানোয়ারের থাবার নিচে এসে পড়ে এবং জানোয়াররা তাদের খুবলে খুবলে ছিন্নভিন্ন করে। বলশেভিক বিপ্লবের পদতলে ৬০-৬৫ মিলিয়ন (৬ কোটি-৬ কোটি ৫০ লাখ) মুসলমানের জান কুরবান হয়। এই মুসলমানেরা পৃথিবীর যে-ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে ছিলো তার পরিমাণ ১৫ মিলিয়ন বর্গমাইল (আফ্রিকা মহাদেশের আয়তনের চেয়েও বেশি)।

কমিউনিস্টরা মুসলমানদের সঙ্গে আসলে কী করেছিলো?

১. পূর্ব তুর্কিস্তান : চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজের সহায়তায় ১৯৩৪ সালে তা দখল করে নেয়। তারা পূর্ব তুর্কিস্তানের ২ লাখ ৫০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে ছিলেন অনেক চিন্তাবিদ, আলেম-উলামা এবং যুবক শ্রেণি। ১৯২৫ সালে চীন বিপ্লব সংঘটিত হয়। তখন ২ লাখ একুশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়।
২. যুগোস্লাভিয়া : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মার্শাল টিটো ২৪ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে।

৩. ক্রিমিয়া : বেলা কোনের (Béla Kohn)-এর শাসনামলে কমিউনিস্টরা ১৯২১ সালে ১ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে এবং ৫০ হাজার মুসলমানকে দেশান্তর করা হয়। ক্রিমিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে, দ্বিতীয় ক্যাটরিনার সময়ে মসজিদ ছিলো ১৫৫৪টি এবং মুসলমান ছিলো ৫ মিলিয়ন। কিন্তু কমিউনিস্টরা মুসলমানদের হত্যা করে, তাদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করে, সাইবেরিয়ায় বিতাড়িত করে এবং মসজিদ ধ্বংস করে। অবশেষে ওখানে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ মিলিয়ন এবং মসজিদ অবশিষ্ট থাকে ৭০০টি। ১৯২০ সালে বলশেভিকরা ক্ষমতায় এসে সমস্ত মসজিদ বন্ধ করে দেয় এবং মুসলমানদের ওপর এবং ক্রিমিয়ার অধিবাসীদের ওপর ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

১৯২২ সালের ১৫ই জুলাই ইঝভেৎসিয়া (Izvestia, রাশিয়ার সংবাদপত্র) তার বন্ধুদের উদ্দেশে (যেমন লেনিন) ক্রিমিয়ার দুর্ভিক্ষ-সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে : এ-বছরের জানুয়ারি মাসে দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত হয় ৩,০২,০৯০ জন এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ১৪,৪১৩ জন। মার্চ মাসে দুর্ভিক্ষ-আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৭৯,০০০ জনে এবং তাদের মধ্য থেকে মৃত্যুবরণ করে ১২,৭৫৪ জন।

জুন মাসে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯২০৬৩ জনে; কিন্তু তাদের মধ্যে কতোজন মারা গিয়েছিলো তা পত্রিকাটি উল্লেখ করে নি। [দেখুন : আল-ইসলাম ফি ওয়াজহিয যাহাফিল আহমার, মুহাম্মদ আল-গাযালি, পৃষ্ঠা ১২৪] ১৯৪৬ সালে ক্রিমিয়ায় মাত্র অর্ধমিলিয়ন মুসলমান বেঁচে ছিলো। স্ট্যালিন তাদেরকে সাইবেরিয়ায় দেশান্তর করেন। [দেখুন : [দেখুন : আল-বালাগ, কুয়েত, সংখ্যা ৪৭৮, নভেম্বর, ১৯৭৮; আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যা ফি মাআকিলিল ইসলাম, আবদুল্লাহ আত-তাল, পৃষ্ঠা ৪৮]

ককেশাস (চেচনিয়া এবং সারকাসিয়ান) : [সূত্র : আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যা ফি মাআকিলিল ইসলাম] স্ট্যালিন ককেশাসের সমস্ত মুসলমানকে সাইবেরিয়া ও আজারবাইজানে দেশান্তর করেন। তাদের মধ্যে ৮ লাখ চেচেন মুসলমান, ৩ লাখ কারাশাই মুসলমান এবং ২

লাখ ৫০ হাজার কালমুক মুসলমান। গোটা চেচনিয়ায় এখন একটি মসজিদও পাওয়া যাবে না।

চেচনিয়ার সব মসজিদ ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে পশুশালা, সিনেমাহল, বিভিন্ন সংগঠনের অফিস, বিনোদনকেন্দ্র এবং ক্লাবে পরিণত করা হয়েছে। অন্যান্য এলাকার অবশিষ্ট মসজিদগুলো সরকারকে শুল্ক প্রদান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে মসজিদে লেনিনের – তিনি অন্যান্য মসজিদকে পর্যটনকেন্দ্র ঘোষণা করেছেন –কথা বলা যায়, মুসলমানরা এই মসজিদের জন্য প্রতিবছর ২৪ হাজার রুবল কর প্রদান করে থাকেন।

৪. পশ্চিম তুর্কিস্তান : [পশ্চিম তুর্কিস্তান সম্পর্কিত তথ্যগুলো জাতিসঙ্ঘে পেশকৃত প্রতিবেদন থেকে গৃহীত। আরো দেখুন : আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যা ফি মাআকিলিল ইসলাম এবং আল-ইসলাম ফি ওয়াজহিয যাহাফিল আহমার]

পশ্চিম তুর্কিস্তানে মোট ৬০ লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ১৯১৯ সালে পশ্চিম তুর্কিস্তান থেকে ২৫ লাখ মুসলমান পালিয়ে যান। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্টরা ১ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ৫ লাখ মুসলমানকে হত্যা ও সাইবেরিয়ায় দেশান্তর করা হয়।

১৯৩৪ সালে ৯৩০০ হাজার মুসলমানকে দেশান্তর করা হয়।

১৯৫০ সালে ৭ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়।

১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারে ৩০ লাখ মুসলমান মারা যান। তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা হয় এবং তা চীনের কাছে পেশ করা হয়।

১৯৫১ সালে ১৩,৫৬৫ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাশিয়ার পারিসংখ্যান থেকে এটা প্রমাণিত যে স্ট্যালিন ১১ মিলিয়ন (১ কোটি ১০ লাখ) মুসলমানকে হত্যা করেছেন। [দেখুন : আল-মুসলিমুনা ফিল ইত্তিহাদিস সুফিয়াতি/ Muslims in the Soviet Union, (দুই ফরাসি লেখক) শাঁতাল কালকাজি এবং আলেকজান্ডার বেনিগিশ। আরবিতে অনুবাদ করেছেন ইহসান হাক্কি, পৃষ্ঠা ২৬৭]

বর্তমানে যেসব মুসলমানের আশঙ্কায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উপলব্ধি ও সতর্কতা আরো বেড়েছে তাদের সংখ্যা হবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন। এই

শতাব্দীর শেষের দিকে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ইনশাআল্লাহ ১০০ মিলিয়নে। ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের বিস্তার ঘটছে।

চতুর্থ আলোচনা : ইসলামি শিক্ষা, মসজিদ এবং আলেম-উলামার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অবস্থান

[বিস্তারিত জানতে দেখুন : আল-মুসলিমুনা ফিল ইত্তিহাদিস সুফিয়াতি/ Muslims in the Soviet Union, (দুই ফরাসি লেখক) শাঁতাল কালকাজি এবং আলেকজান্ডার বেনিগিশ। আরবিতে অনুবাদ করেছেন ইহসান হাক্কি, পৃষ্ঠা ৬৭-২৭৮]

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। তবে ধর্ম-শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করার জন্য কেবল কিছু ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবে অনুমোদিত।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কেবল একটি মাদরাসার অনুমোদন দেয়া হয়েছিলো। এটি হলো বুখারার মিরি গারব মাদরাসা। বন্ধ করে দেয়ার পর পুনরায় এটি চালু করা হয়। [দেখুনঃ বিস্তারিত দেখুন : আল-মুসলিমুনা তাহতাস সাইতারাতিশ শুয়ুয়িয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৬৪ ও তার পরবর্তী]

কেবল এক রাশিয়াতেই ১৯৩১ সালে মসজিদ ছিলো ২৬২৭৯ টি। বুখারা ও খিভার অসংখ্য মসজিদ বাদ দিয়েই মসজিদের এই সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র Soviet Warnews-এর ভাষ্য অনুযায়ী পরে মুসল্লিদের জন্য উন্মুক্ত মসজিদ ছিলো মাত্র ১৩১২ টি।

১৯৬৪ সালে ফরাসি ভাষায় তাশকন্দ সম্পর্কিত একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে, কাজখস্তানসহ গোটা মধ্য-এশিয়ায় মসজিদের সংখ্যা মাত্র ২৫০ টি।

আলেম-উলামা : ১৯১৭ সালে (বুখারা ও খিভা ব্যতীত) আলেম-উলামা ৪৫৩৩৯ জনের কম ছিলেন না। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৫২ জনে; কারণ, তিরিশের দশকে অধিকাংশ আলেম-উলামাকে হত্যা হয়েছিলো।

[যাকাত প্রদান ছিলো নিষিদ্ধ। হজ করাও ছিলো অসম্ভব। ১৯৪৫ সালের পর হজের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, এমনকি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত হজ পালনকারী ব্যক্তির সংখ্যা একশোর বেশি ছিলো না। আর

রমযান মাসের রোযা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ না হলেও কার্যত নিষিদ্ধ ছিলো। রোযা রাখা ছিলো অসম্ভব। অবশেষে কয়েকজন মুফতি মুসলমানদের এই ফতোয়া দিতে বাধ্য হন যে তারা যেনো তিন দিন রোযা রাখে, যাতে তিন দিন তিরিশ দিনের স্থলাভিষিক্ত হয়। এই তিন দিন হলো রমযানের ১ম, ১৫শ এবং ৩০শ দিন। দেখুন : আল-মুসলিমুনা ফিল ইত্তিহাদিস সুফিয়াতি, পৃষ্ঠা ২৭৬ ও তার পরবর্তী]

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা : কমিউনিস্টরা একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে এবং এর নাম দেয় স্রষ্টাহীনদের সঙ্ঘ। যুদ্ধের পর রাজনৈতিক তথ্যপ্রচার সংস্থা গড়ে তোলা হয়। এর অধিকাংশ কর্মকাণ্ড ছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই।

কাজাখস্তান অঞ্চল : কাজাখস্তান অঞ্চলে সংস্থাটি ১৯৪৬-১৯৪৮ সালের মধ্যে ৩০৫২৮ টি বক্তৃতার আয়োজন করে। এর মধ্যে ২৩০০০ টি বক্তৃতাই ছিলো ইসলামের বিরুদ্ধে।

উজবেকিস্তান : ১৯৪১ সালে ইসলামের বিরুদ্ধে ১০ হাজারেরও বেশি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

তুর্কমেনিস্তান : ১৯৬৩ সালে ইসলামের বিরুদ্ধে ৫ হাজারেরও বেশি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়।

পুস্তক রচনা : ১৯৫৫-১৯৫৭ সালের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ৮৪ টি পুস্তক রচনা করা হয় এবং সেগুলোর ৮ লাখ কপি মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ২১৯টি পুস্তক ও বুলেটিন মুদ্রিত হয়।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ :

দুই কালিমায়ে শাহাদাত : মুসলমানদেরকে কালিমা দুটি গোপনীয়ভাবে পড়তে হয়।

যাকাত : যাকাত প্রদান নিষিদ্ধ।

রোযা : কার্যত অসম্ভব।

হজ : প্রথমে নিষিদ্ধ ছিলো। পরে তাত্ত্বিকভাবে তার অনুমোদন দেয়া হয়।

পবিত্র কুরআন : আমি কিছু আইন-কানুন পর্যবেক্ষণ করেছি, যাতে বলা হয়েছে কারো কাছে পবিত্র কুরআন পাওয়া গেলে তাকে এক বছর কারাদণ্ড দেয়া হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কমিউনিস্ট এবং ফিলিস্তিন

প্রথম আলোচনা : উসমানি খেলাফতের পতনে বলশেভিক ও ইহুদিদের নীলনকশা

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে বলশেভিক আন্দোলন সফল হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তার নেতারা ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের স্বীকৃতি দিয়ে সিদ্ধান্ত জারি করেছিলেন। ইহুদিবাদী (জায়নিস্ট) আন্দোলনের নেতারা মনে করেন ইহুদি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন কার্ল মার্কস। বর্তমান সময়ে ইহুদিবাদী আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ, ইহুদি ধর্মগুরু ইসহাক ওয়াইজ (Isaac Mayer Wise/আইজাক মায়ের ওয়াইজ)[৪৪] বলেন, 'কার্ল মার্কস ইহুদি ধর্মগুরু মোর্দেখাই মার্কসের পৌত্র। কার্ল মার্কসের আত্মা, তাঁর সাধনা ও কর্মব্যাপ্তি, তাঁর উদ্যম এবং যা-কিছু তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সবকিছুতেই আছে ইসরাইলের জন্য একনিষ্ঠ ভালোবাসা; যাঁরা ইহুদি জাতিরাষ্ট্রের জন্মে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে বাগাড়ম্বর করেন তাঁদের অধিকাংশের চেয়ে কার্ল মার্কসের নিষ্ঠা ছিলো বেশি।' [আত-তারিখুস সিররিয়্যু লিল-আলাকাতিলশ শুয়ুয়িয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৯] এরপর ইহুদিবাদী সংগঠনগুলোর নেতা থিওডোর হার্জল[৪৫] ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বেশ গুরুত্বের সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৫ সালে 'ইহুদি রাষ্ট্র'[৪৬] নামে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি ১৮৯৭

---

[৪৪] মার্কিন ইহুদি। লেখক, সম্পাদক এবং সংস্কারবাদী ধর্মগুরু। জন্ম : ২৯ শে মার্চ, ১৮১৯ এবং মৃত্যু : ২৬ শে মার্চ, ১৯০০।

[৪৫] Theodor Herzl। জন্ম : ২ মে, ১৮৬০ এবং মৃত্যু : ৩ জুলাই, ১৯০৪। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান বংশোদ্ভূত সংবাদিক, নাট্যকার, রাজনৈতিক কর্মী এবং লেখক। তাঁকে আধুনিক রাজনৈতিক ইহুদিবাদের জনক মনে করা হয়। ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহুদিদের ফিলিস্তিনে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করেন।

[৪৬] মূল গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় Der Judenstaat নামে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজিতে সাধারণভাবে The Jewish State অনুবাদ করা হয়। আরবিতে গ্রন্থটির অনুবাদ الدولة اليهودية নামে প্রকাশিত হয়েছে।

সালে (সুইজারল্যান্ডে) বাসেল সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৪৭] এই সম্মেলনে তিনি বিশ্বের তাবৎ ইহুদিবাদী সংগঠনকে একত্র করেন। এই সম্মেলন থেকেই The Protocols of the Elders of Zion[48] প্রকাশিত হয়।

১৯০১ সালে থিওডোর হার্জল ফিলিস্তিনের মানব বসতিহীন ভূমি ক্রয় করার জন্য সুলতান আবদুল হামিদের সঙ্গে চেষ্টা-চরিত্র করেন। কিন্তু সুলতান হার্জলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০২ সালে আবারও থিওডোর হার্জল আবারও উদ্যোগ নেন এবং সুলতান আবদুল হামিদের সঙ্গে চেষ্টা-চরিত্র করেন। এবার হার্জলের সঙ্গে ফ্রিম্যাসন গুপ্তসঙ্ঘের সদস্য ইহুদি আইনজীবী ইমানুয়েল কারাসুও (Emmanuel Carasso বা Emanuel Karasu) সুলতান আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। [তুরস্কে উসমানি খলিফা ও খেলফতের পতন ঘটানোর পর কারাসু মিসরে যান। ওখানে তিনি ইহুদি ধর্মগুরুর নাম ধারণ করে দিন-রাত কাজ করে যেতে থাকেন। মিসরে তাঁর নাম ছিলো নাহুম হায়িম। মিসরের সেনা অভ্যুত্থানের সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ও জোরালো যোগসূত্র ছিলো। মিসরীয় লেখক আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছিলেন না। একদিন তিনি নাহুম হায়িমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরের দিনই জামাল আবদুন নাসের তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করেন।]

থিওডোর হার্জল সুলতান আবদুল হামিদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেন :

১. নগদ ১৫ কোটি ইংলিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান;
২. উসমানি সাম্রাজ্যের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ;

---

[৪৭] এটি প্রথম জায়নিস্ট কংগ্রেস এবং জায়নিস্ট ওর্গানাইজেশনের (ZO) উদ্বোধনী কংগ্রেস। জায়নিস্ট ওর্গানাইজেশন পরে ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট ওর্গানাইজেশনে (WZO) রূপান্তরিত হয়। সুইজারল্যান্ডের বাসেলে ১৮৯৭ সালের ২৯ আগস্ট থেকে ৩৯ শে আগস্ট পর্যন্ত থিওডোর হার্জলের আয়োজনে ও সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস একটি জায়নিস্ট প্লাটফর্মের সূচনা করে, যা বাসেল প্রোগ্রাম নামে পরিচিত এবং জায়নিস্ট ওর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা করে।

[৪৮] এটিকে The Protocols of the Meetings of the Learned Elders of Zion-ও বলা হয়। এই প্রোটোকলে ইহুদিরা কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার পরিকল্পনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি প্রথমে রাশিয়া থেকে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এটি গোটা বিশ্বে প্রচার করা হয়। হেনরি ফর্ড একাই এই প্রোটোকলের ৫,০০,০০০ কপি মুদ্রণ করে আমেরিকায় বিতরণ করেন।

৩. উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য নৌবহর নির্মাণ;
৪. জেরুজালেমে (আল-কুদসে) উসমানি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;
৫. ইউরোপ ও আমেরিকায় সুলতান আবদুল হামিদের রাজনীতিকে সুরক্ষা প্রদান। [মাকায়িদু ইহুদিয়্যাহ ইবারাত তারিখ/ যুগে যুগে ইহুদি ষড়যন্ত্র, আবদুর রহমান হানবাকা, পৃষ্ঠা ২৮৪]

এসবকিছুই ছিলো ইহুদিদের ওখানে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদানের বিনিময়ে দেওয়ার জন্য।

কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। থিওডোর হার্জল তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, 'সুলতান আবদুল হামিদ আমাকে এই পথে আর একটি পদক্ষেপ না করার উপদেশ দেন। কারণ তিনি ফিলিস্তিনের এক বিঘত জমিও আমাদের জন্য ছাড়তে পারবেন না। কারণ ফিলিস্তিন তাঁর রাজ্য নয়; বরং তা ইসলামি উম্মাহর রাজ্য। ইসলামি উম্মাহ ফিলিস্তিনের জন্য সংগ্রাম করেছে এবং ফিলিস্তিনের মাটি তাদের সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।' সুলতান আবদুল হামিদ বলেন, 'আমার সাম্রাজ্য থেকে ফিলিস্তিনের বিচ্ছিন্ন হওয়া দেখার চেয়ে আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা আমার জন্য বেশি সহজ।' সুলতান আবদুল হামিদ তাঁর শায়খ মাহমুদ আবুশ শামাতকে এই মর্মে পত্র লেখেন যে, 'ইহুদিরা আমাকে ১৫ কোটি ইংলিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছে। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি, তোমরা যদি আমাকে পৃথিবীভর্তি স্বর্ণও প্রদান করো, তারপরও আমি কোনোভাবেই এবং কিছুতেই তোমাদের এই আবদার রক্ষা করতে পারবো না। আমি তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে উম্মতে মুহাম্মদি ও ইসলামি মিল্লাহর খেদমত করে যাচ্ছি। আমি মুসলমানদের—আমার পিতৃপুরুষ উসমানি খলিফা ও সুলতানদের সুনামকে কলঙ্কিত কিছুতেই করতে পারবো না। [মাকায়িদু ইহুদিয়্যাহ ইবারাত তারিখ/ যুগে যুগে ইহুদি ষড়যন্ত্র, আবদুর রহমান হানবাকা, পৃষ্ঠা ২৮৪। ইহুদি ইতিহাসবিদ বার্নাড লুইস তাঁর The Emergence of Modern Turkey (১৯৬১) গ্রন্থে বলেন, ফ্রিম্যাসনের সভ্য ও ইহুদি ভাইয়েরা গোপনীয়ভাবে সুলতান আবদুল হামিদের অপসারণে কাজ করে গেছেন। কারণ তিনি ছিলেন চরম ইহুদিবিরোধী। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য মাত্র এক বিঘত ভূমি প্রদানের বিষয়টিও তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।]
সুলতান আবদুল হামিদের পাঠানো চিঠি এখানো শায়খ আবুশ শামাতের নাতিদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

১৯০৪ সালে থিওডোর হার্জল মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুর আগে ইহুদিবাদী (জায়নিস্ট) আন্দোলনের নেতৃত্ব হায়িম ওয়াইজম্যানকে (Chaim Azriel Weizmann)[৪৯] প্রদান করেন। ১৯১৬ সালের মে মাসে হায়িম ওয়াইজম্যান জুরিখে ইহুদি শিল্পপতি ড্যানিয়েল শোয়েনের বাড়িতে ইহুদিবাদী লেখক জ্যাক লেভির উপস্থিতিতে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন : ১. রাশিয়ার জারকে উৎখাতের জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিকল্পনা এবং ২. প্রাচ্যের জন্য ইহুদিদের পরিকল্পনা। লেনিন ওয়াইজম্যানকে বলেন, 'ইউরোপের রাজ্যসমূহ এবং সেগুলোর শাসকদের দুঃস্বপ্ন থেকে ইহুদিদের মুক্তি, রাষ্ট্রে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের আবশ্যকীয় সম্মান ও ব্যক্তিত্ব—সবকিছু রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার ওপর নির্ভর করছে। ডুবে-থাকা ইহুদি জাতির জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাই বাস্তবায়িত করবে, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব তাদের জন্য যা বাস্তবায়িত করতে পারে নি। রাশিয়া থেকে জার এবং তাদের গির্জার বিনাশের পর মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার পরিকল্পিত ভিত্তির ওপর, যাতে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তার দূরবর্তী লক্ষ্যগুলোও বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়।' [দাওরুদ দুয়ালিল ইশতিরাকিয়্যা লি-তাকবিনি ইসরাইল, ড. ইবরাহিম আশ-শারিকি, পৃষ্ঠা ১৭]

ওয়াইজম্যান লেনিনের চিন্তা-ভাবনায় আশ্বস্ত বোধ করেন এবং লেনিনকে বলেন, প্রাচ্যের দ্বারগুলো উন্মোচন করা এবং ফিলিস্তিনে ইহুদিদের স্থায়িত্ব লাভ করা পরিপূর্ণভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপর নির্ভরশীল। উসমানি সাম্রাজ্যের বিনাশের মাধ্যমেই (ইহুদিদের) পিতৃভূমিতে পৌঁছানোর পথে যাবতীয় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তার আয়ু আর বেশি দিন নেই এবং তার পতন আসন্ন। রুশ সমাজতান্তিক বিপ্লব তার লক্ষ্যগুলো সফল করার পর ফিলিস্তিনে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর একটি ইহুদি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। ' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭]

জ্যাক লেভি বলেন, 'জুরিখে আমি বেশ কয়েকটি বৈঠকের আয়োজন করেছি। এগুলোতে ওয়াইজম্যান উপস্থিত ছিলেন। এ-সময় আমি লেনিনকে একজন বিপ্লবী ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, যিনি তাঁর বাস্তবায়িত

---

[৪৯] জায়নিস্ট নেতা এবং ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট। পেশায় একজন রসায়নবিদ। জন্ম : ২৭ শে নভেম্বর, ১৮৭৪ এবং মৃত্যু : ৯ই নভেম্বর, ১৯৫২ ।

কর্মকাণ্ডের জন্য ট্রটস্কির কাছে নিজেকে ঋণী ভাবতেন। তিনি আসলে এমন জাতির নেতৃত্বদানের উপযুক্ত ছিলেন না যার সদস্যরা সভ্য ও সচেতন। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮]

১৯২০ সালে মস্কো ভ্লাদিমির ঝাবোতিনস্কিকে ফিলিস্তিনে পাঠায়। তিনি ছিলেন ইহুদি সমাজতন্ত্রী। ফিলিস্তিনে তাঁর দায়িত্ব ছিলো ইহুদি যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ভাগ ভাগ করে দল তৈরি করা।

বলশেভিক সরকার ফিলিস্তিনের ভূমিতে উপনিবেশ তৈরির জন্য জার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদ থেকে দশ লাখ গোল্ড-লিরা বরাদ্দ দেয়। [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬] ফিলিস্তিনে উপনিবেশ তৈরির জন্য ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইহুদিদেরকে যত সম্পদ প্রদান করা হয় তার চল্লিশ ভাগই প্রদান করে রাশিয়া।

সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিলো ইহুদি সামরিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা। ইহুদি সামরিক ইউনিটের অধিকাংশ সদস্য ছিলো রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া এবং পোল্যান্ডের; যারা ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করেছিলো তারাও ছিলো; যে-ইহুদি সেনাবাহিনী ব্রিটিশ সৈনিকদের সঙ্গে একত্র হয়ে জার্মানি ও ইতালির বিরুদ্ধে মিসরের আল-আমিন ও লিবিয়ার মরুভূমি যুদ্ধ করেছিলো তাদের সদস্যরা ছিলো; এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মোশে দায়ান এবং আইজাক রবিন (ইসহাক রবিন)। স্ট্যালিনের সম্মতিতে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ইহুদিদেরকে ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র দেয়া হয়। মস্কোর নির্দেশে মোশে শারেতের (Moshe Sharett)[৫০]-এর তত্ত্বধানে যুগোস্লাভিয়া ও রোমানিয়া জাহাজগুলো অস্ত্রে বোঝাই করা হয়।

ইয়ালটা সম্মেলন-১৯৪৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিন বিশ্বনেতা একত্রে মিলিত হন : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট[৫১], সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান যোসেফ স্ট্যালিন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ইয়ালটা সম্মেলন

---

[৫০] জন্মনাম Moshe Shertok। ইসরাইলের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জন্ম : ১৬ অক্টোবর, ১৮৯৪ এবং মৃত্যু : ৭ জুলাই, ১৯৬৫।

[৫১] বত্রিশতম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ১৯৩৩ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর জন্ম ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮২। তিনি ছিলেন জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা।

করেন।[৫২] তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নাৎসিদের ধ্বংস করে দিতে হবে; জার্মানিকে দখলকৃত ভূমির সঙ্গে মিলিয়ে মিত্রদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে; জাপানি সাম্রাজ্যের শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে; পূর্ব ইউরোপে গণতান্ত্রিক শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁরা জায়নিস্ট স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা করেন। স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত দাবি-দাওয়া ছিলো :

১. জার্মানির ওপর ৫০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে। ইউরোপে যেসব ইহুদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যেসব ইহুদি ফিলিস্তিন বা আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ বণ্টন করে দিতে হবে।
২. ফিলিস্তিনে ইহুদিদের শরণার্থী হতে সব ধরনের শর্ত তুলে নিতে হবে।
৩. ইহুদিদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব গঠনে তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

উল্লিখিত তিন নেতা ছিলেন ইহুদি : বংশগত দিক থেকে অথবা সম্পর্ক ও আত্মীয়তার কারণে তাঁরা ইহুদি ছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট : তিনি একটি ইহুদি পরিবারের বংশোদ্ভূত। ইহুদি পরিবারটির পূর্বনাম ছিলো রোজেনবার্গ। পরবর্তীকালে এটি রুজভেল্ট নাম গ্রহণ করে। পরিবারটি স্পেন থেকে আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করে। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের দাদা ক্লিনটন রুজভেল্ট[৫৩] ছিলেন কমিউনিস্ট

---

[৫২] ১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি ইয়ালটা সম্মেলন (Yalta Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এটিকে Crimea Conference-ও বলা হয়। ক্রিমিয়ার ইয়ালটার লিভাদিয়া প্রাসাদে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ইউরোপের পুনর্গঠন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিগুলোর পুনর্প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করাই ছিলো সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ইয়ালটা সম্মেলনে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার কয়েটি হলো :

১. নাৎসি জার্মানির নিঃশর্ত অত্মসমর্পণ। যুদ্ধের পর জার্মানি এবং বার্লিন চারটি দখলকৃত জোনে খণ্ডিত হবে।
২. স্ট্যালিন একমত হন যে ফ্রান্স জার্মানিতে দখলকৃত চতুর্থ জোনের অধিকারী হবে। তবে এটি আমেরিকান ও ব্রিটিশ জোনের বাইরে থাকবে।
৩. জার্মানিকে নিরস্ত্র করতে হবে এবং নাৎসিমুক্ত করতে হবে।
৪. জার্মানি যুদ্ধের যে-ক্ষতিপূরণ দেবে তার একটি বলবৎ শ্রমিকদল। জার্মানি আক্রান্তদের যে-ক্ষতি করেছে বলবৎ শ্রমিকদল তা মেরামত করে দেবে।

[৫৩] ক্লিনটন রুজভেল্ট (জন্ম : ৩ নভেম্বর, ১৮০৪ এবং মৃত্যু : ৮ আগস্ট, ১৮৯৮) ছিলেন মার্কিন রাজনীতিবিদ। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির সংস্কারপন্থী অংশ ইক্যুয়াল রাইটস পার্টির প্রথম দিকের এবং অন্যতম প্রধান সদস্য। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The

ম্যানিফেস্টো প্রকাশের উদ্দেশ্যে কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলসের জন্য অর্থ সংগ্রহের যে-সংস্থা গঠিত হয়েছিলো তার তিন প্রতিষ্ঠাতার একজন।

ইহুদিরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে একটি গোল্ড মেডেল দিয়েছিলো। তাতে লেখা ছিলো : 'সমস্ত কল্যাণ ও প্রজ্ঞা ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের জন্য। তিনি আমাদের নতুন নবী। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

যোসেফ স্ট্যালিন : তিনি বংশগত দিক থেকে ইহুদি ছিলেন না, যদিও তাঁর স্ত্রী ইহুদি ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলো রোঝা কাযানোভিচ[৫৪]। এই ইহুদি সুন্দরী তাঁর পরিবারের সঙ্গে থেকে প্রায় তিন দশক সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালনা করেন, যতদিন স্ট্যালিন শাসনক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর সহোদর লাঝার কাযানোভিচ স্ট্যালিন ও মিখাইলোভিচ মলোতোভের[৫৫] ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। [দেখুন : আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার, পৃষ্ঠা ৫০ ও তার পরবর্তী]

উইনস্টন চার্চিল : তিনি ছিলেন ইহুদিদের সৃষ্টি।

ইয়ালটা সম্মেলনে চার্চিল ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট থেকেও বেশি উত্তেজিত ছিলেন স্ট্যালিন। তিনি জার্মানির ওপর ইহুদিদেরকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে দাবি তোলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তিন মিলিয়ন ইহুদির জন্য ফিলিস্তিনে ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপনের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে। [দেখুন : দাওরুদ দুয়ালিল ইশতিরাকিয়্যা লি-তাকবিনি ইসরাইল, ড. ইবরাহিম আশ-শারিকি, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭, ইয়ালটা সম্মেলনের নথিপত্র এবং নুরেমবার্গের সরকারি নথিপত্র (১৯৪৫-১৯৪৬) থেকে উদ্ধৃত; আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৫৫]

তবে এ-সময় চার্চিল মুচকি হেসেছিলেন এবং স্ট্যালিনকে বলেছিলেন, 'ফিলিস্তিনের ভূমি তো তিন মিলিয়ন ইহুদির জন্য যথেষ্ট নয়।' এই সম্মেলনেই যোসেফ স্ট্যালিন নুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে পেশ করার জন্য নাৎসিদের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে প্রাচ্যের কয়েকজন নেতার নাম তালিকাভুক্ত

Science of Government, Founded on Natural Law (১৮৪১) এবং Introduction to the Universal Science (১৮৫৮)।

[৫৪] স্ট্যালিনের প্রথম স্ত্রী একবছর ঘর করার পরই মারা যান। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম নাদেঝদা সেরগিভনা আলিলুয়েভা। রোঝা কাযানোভিচ নামটি কেনো এলো তা স্পষ্ট নয়।

[৫৫] সোভিয়েত রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ। প্রবীণ বলশেভিক। সোভিয়েত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

করার দাবি জানান। যুগোস্লাভিয়া নাৎসি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে আল-হাজ মুহাম্মদ আমিন আল-হুসাইনি রহ.-এর নাম[৫৬] নির্দিষ্ট করে দেয়।

ফিলিস্তিনের ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্তটি ১৯৪৭ সালের ২৯ শে নভেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে (General Assembly) উত্থাপিত হয়। একটি কণ্ঠভোট বেশি পেয়ে তা গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটিকে জয়যুক্ত করার জন্য আমেরিকা ও রাশিয়া বড়ো ভূমিকা পালন করে। এরপর সিদ্ধান্তটি নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) স্থানান্তরিত হয়। ফিলিস্তিনিরা এই সিদ্ধান্তটি কেবল কানেই শুনেছিলো। ফলে তা ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে চিরস্থায়ী যুদ্ধ হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই আমেরিকা এতে নিজের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালের ৪ মার্চ হোয়াইট হাউস ভূমি বণ্টনের চিন্তা থেকে ফিরে এসে ফিলিস্তিনকে একটি আন্তর্জাতিক আজ্ঞার অধীন ন্যস্ত করার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি অস্টিন আন্তর্জাতিক আজ্ঞার বিষয়টি জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করেন। ফরাসি প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি গ্রোমিকো প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯ শে মার্চ বলেন, 'জাতিসঙ্ঘের কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের নেই।' এরপর তিনি আমেরিকাকে আক্রমণ করে বলেন, 'অবশ্যই আমরা আমেরিকাকে ভূমিবণ্টনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করার পরিণাম ভোগ করাবো। আমরা জানি, আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের কৌশল এবং পেট্রোলের প্রতি ললুপ।'

১৯৪৮ সালের ১৬ই এপ্রিল গ্রোমিকো বলেন, 'ফিলিস্তিন থেকে সশস্ত্র আরব যোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত জরুরি। জাতিসঙ্ঘের উচিত আরবদের চরমতম শাস্তি প্রদান করা, যা তাদের চৈতন্য ফিরিয়ে আনবে। বিশেষ সুবিধা এবং বিশেষ আচরণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চয় ইহুদিদের রয়েছে।'

এরপর তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নামে হুমকি প্রদান করে বলেন যে অবশ্যই তাঁরা শান্তি রক্ষা এবং ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার জন্য শক্তি নিয়োগ করবেন।

চেকোস্লোভাকিয়া : ইহুদিদের পাল্লা ভারী হওয়ার ক্ষেত্রে চেকোস্লোভাকিয়ার অস্ত্র, জাহাজ এবং মানবমণ্ডলীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে, বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার সময়।

---

[৫৬] ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আরব নেতা। তাঁর জন্ম ১৮৯৭ সালে এবং মৃত্যু ৪ জুলাই, ১৯৭৪। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ইহুদিবাদ বিরোধী ছিলেন।

চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি জাতিসঙ্ঘে বলেন, 'ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রাচ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।'

যুগোস্লাভিয়া : এই রাষ্ট্রটি ইসরাইলের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত সববেচে বেশি উৎপন্ন-পণ্য আদান-প্রদান করে। তারা ইসরাইল থেকে টক জাতীয় ফল, রাসায়নিক পণ্য এবং অন্যান্য ইসলাইলি দ্রব্য আমদানি করে। রাষ্ট্রটি জাতিসঙ্ঘে ঘোষণা করে, ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত ইহুদিদের তাদের সব অধিকার প্রদানে যথেষ্ট নয়। আরবদের উচিত এই বণ্টন মেনে নিয়ে ইহুদিদের জন্য কুরবান পেশ করা।

১৯৪৮ সালের এই সময়ে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ইউক্রেনের প্রতিনিধি। ফিলিস্তিনের সমস্যাটি ছিলো তখন আলোচ্য বিষয়। নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রধান যখন ইহুদিদের প্রতিনিধিকে 'ইসরাইল সরকারের প্রতিনিধি' বলে সম্বোধন করেন তখন সব সদস্য অত্যন্ত বিস্মিত হন। কারণ, এটা যেনো ইহুদিদের রাষ্ট্রের মৌখিক স্বীকৃতি।

১৯৪৮ সালের ১৪ই মে জাতিসঙ্ঘ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করে। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদানের দশ মিনিটের মধ্যেই তেলআবিবে বৃষ্টির মতো অভিনন্দন-বার্তা আসতে থাকে। প্রথম তারবার্তা আসে মার্কিন ইহুদি নেতা হেনরি ট্রুম্যানের পক্ষ থেকে। চার মিনিট পর আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্ট্যালিনের তারবার্তা। । [দেখুন : দাওরুদ দুয়ালিল ইশতিরাকিয়্যা লি-তাকবিনি ইসরাইল, ড. ইবরাহিম আশ-শারিকি, পৃষ্ঠা ৫২, নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসঙ্ঘের ১৯৪৮ সালের বসন্তকালীন আলোচনা থেকে উদ্ধৃত।]

দ্বিতীয় আলোচনা : জাতিসঙ্ঘে কমিউনিস্টদের বক্তব্য

১৯৪৭ সালের ২রা মে গ্রোমিকো বলেন, 'আমাদের সবসময়ই মনে রাখা উচিত, ফিলিস্তিনের সমস্যা ইহুদিদের সমস্যা ছাড়া কিছু নয়। এ-কারণেই ইহুদিদের কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় না এনে এবং তাদের উদ্বেগকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই। এ-কথা কেবল ফিলিস্তিনের ইহুদিদের ক্ষেত্রে নয়, বরং সব জায়গার ইহুদিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।' [আত-তারিখুস সিররিয়্যু লিল-

আলাকাতিলশ শুয়ুয়িয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১১৮; আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৬০]

১৯৪৭ সালের ৩রা মে গ্রোমিকো বলেন, 'ফিলিস্তিনের সমস্যা সব ইহুদিকেই উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। যখনই আরবদের কণ্ঠস্বর উঁচু হচ্ছে, এটি যেমন তাদেরকে শঙ্কিত করে তুলছে, তেমনি আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নকেও শঙ্কিত করে তুলছে। [আত-তারিখুস সিররিয়্যু লিল-আলাকাতিলশ শুয়ুয়িয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১১৯; আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৬৩]

১৯৪৭ সালের ৩রা মে পোল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেন, 'আরবদের প্রতিক্রিয়াশীলতার অবসান না ঘটলে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।'

১৯৪৭ সালের ৫ই মে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'বিশ্বের ইহুদিরা আমাদের পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে।'

১৯৪৭ সালের ৮ই মে যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আমরা সবাই ইহুদি জাতির সেবায় পারস্পরিক সহযোগিতা করবো। তারা যে-শাস্তি ভোগ করেছে তা যথেষ্ট। এখন তাদের এবং আমাদের সময় এসেছে যে তাদের প্রদক্ষিণস্থল নির্দিষ্ট হবে।'

১৯৪৭ সালের ১০ই মে যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'ফিলিস্তিনি জাতি কি স্বাধীনতার উপযুক্ত হয়েছে?'

১৯৪৭ সালের ১২ই মে পোল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেন, 'ফিলিস্তিনে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনে ইহুদিদের সহায়তা করা আবশ্যক।'

১৯৪৭ সালের ১৪ই মে গ্রোমিকো বলেন, 'ইহুদি জাতির নামে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানাই।'

১৯৪৭ সালের ৮ই অক্টোবর চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'ইহুদিরাই আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা পাওয়ার উপযুক্ত, আরবরা নয়।'

১৯৪৭ সালের ১৩ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি সায়মন বলেন, 'ফিলিস্তিনে আবশ্যকভাবে একটি রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার ইহুদিদের রয়েছে।'

১৯৪৭ সালের ১৪ই অক্টোবর যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'সমাজতান্ত্রিক আত্মার প্রতি আরবদের মুখাপেক্ষিতাই ইহুদিদের সঙ্গে তাদের দাম্ভিকতার কারণ।'

১৯৪৭ সালের ১৬ই অক্টোবর চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি বলেন, 'বিশ্বের ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে চায়। সুতরাং আরবদের বিরোধিতাকে এড়িয়ে যেতে হবে।'

১৯৪৭ সালের ২৪ শে নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি বলেন, 'আমরা নিজেরাই ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রস্তুত।'

১৯৪৭ সালের ২৪ শে নভেম্বর পোল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেন, 'সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যৌথ কল্যাণ রয়েছে।'

১৯৪৮ সালের ৭ই মার্চ গ্রোমিকো বলেন, 'সকলেরই উচিত ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা।'

১৯৪৮ সালের ৩০ শে মার্চ গ্রোমিকো বলেন, 'ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নে আমরা অবশ্যই বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'

১৯৪৮ সালের ২৩ শে এপ্রিল গ্রোমিকো বলেন, 'জাতিসঙ্ঘের উচিত গাজায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।'

১৯৪৮ সালের ১২ ই মে গ্রোমিকো বলেন, 'আরবের প্রতিক্রিয়াশীলরাই কেবল ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করে।'

১৯৪৮ সালের ২৯ ই মে গ্রোমিকো বলেন, 'নিশ্চয় আরব ও ইহুদিদের কল্যাণ অভিন্ন; তা রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় এবং সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বে একত্রে মিলিত হওয়ায়।'

১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি জ্যাকব মালেক নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, 'আমি মনে করি, ইসরাইল যেভাবে আছে সেভাবেই তাদের পিতৃপুরুষের জন্মভূমি হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে। সাম্রাজ্যবাদের কুশীলবরা আর পেট্রোল-সজ্মগুলোই ইসরাইলের শত্রু।' [আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ৯০ ও তার পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।]

ফিলিস্তিনের ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারে ভোট প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিসঙ্ঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের নেতা ছুটে এসে তাঁর অফিসকক্ষে প্রবেশ করে এবং মদের পেয়ালা বের করে ইহুদি প্রতিনিধি দলের সদস্যদের উদ্দেশে পরিবেশন করেন। তিনি সবাইকে মদ পান করার আহ্বান জানান। ইহুদিদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক বন্ধুরা এই ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। [আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, পৃষ্ঠা ১০০, ডেভিড হরভিৎস রচিত State at the Stage of Birth গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

জাতিসঙ্ঘের ও নিরাপত্তা পরিষদের দলিল-দস্তাবেজ থেকে অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত-করা এসব বক্তব্য প্রতিটি লাল কমিউনিস্টকে—যারা ইহুদিদের বিরোধিতায় চোয়াল ঠোকাঠুকি করে বা ফিলিস্তিনের নামে মজুরি খাটার কথা বলে—চপেটাঘাত করছে। তারা ওইসব নির্বোধদের ধোঁকা দিচ্ছে যারা কমিউনিজম সম্পর্কে এ-ব্যাপারগুলো ছাড়া আর কিছুই জানে না যে, কমিউনিজম সাম্রাজ্যবাদ- ও সম্প্রসারণবাদবিরোধী; তা মানবজাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং শ্রেণিবৈষম্য দূরীভূত করতে চায়।

শুরুর দিকে উদাসীন ও অজ্ঞরা কমিউনিজমের প্রতীক ও বলশেভিক বিপ্লবের পতাকা দেখে ধোঁকায় পতিত হয়েছিলো। তারা কমিউনিজমে প্রবেশ করেছিলো এই ভেবে যে, তা কদর্য পশ্চিমা ও মার্কিন প্রেতাত্মা থেকে তাদের মুক্তি দেবে, যে-প্রেতাত্মার দুই হাতের ওপর ভর করে আরব প্রাচ্যীয় এলাকা ও ইসলামি দেশগুলোতে শাসনের সময় তারা কর্তৃত্ব ভোগ করেছে। কিন্তু তা তো বিভ্রান্তিকর মরীচিকা, খুব দ্রুতই তার মোহজাল দর্শকদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং নিকটে-চলে-আসা গ্রীষ্মের মেঘ দূরে সরে যায়। কবিতা—

المستجير بعمرو عند كربته　　كالمستجير من الرمضاء بالنار

"সঙ্কটের সময় আমরের সাহায্য প্রার্থনাকারী যেনো কুণ্ডের কাছে আগুনের সাহায্য প্রার্থনাকারী।"

কমিউনিস্টদের কলঙ্কজনক অবস্থান গ্রহণের পর ১৯৪৭ সালে ও ১৯৬৭ সালে জাতীয় ইস্যুগুলোর উদ্দেশে তাদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়ে পড়ার পর তারা অনেক সাহায্যকারী বন্ধুকে হারিয়েছে, আহ্বানের চাকচিক্য এসব বন্ধুর চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলো। অবশেষে অকস্মাৎ তিক্ত বাস্তবতার ওপর তারা তাদের চোখ খোলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
আরব কমিউনিস্ট ও ফিলিস্তিন

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি আরব বিশ্বে যেসব কামিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা রয়েছে তার সবগুলো ইহুদিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং তারা সেগুলোতে সক্রিয় রয়েছে। আর যেসব কমিউনিস্ট নেতা আরব বংশোদ্ভূত, ইহুদি নেতারা তাঁদের মগজ ধোলাই করার পর তাঁরা ইহুদি নেতাদের হাতে দীক্ষা নিয়েছেন ফলে তাঁরা ইহুদিতে পরিণত হয়েছেন। ইহুদিরা এই শিষ্যদের ওপর এবং আরবে সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীলতার ব্যাপারে অনেক আশা ঝুলিয়ে রেখেছিলো।

১৯৪৮ সালে আর কমিউনিস্টরা—এরা ছিলো ফিলিস্তিনের সন্তান—মস্কোর উদ্দেশে লেখে : ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জন্য একটি জাতিরাষ্ট্র বানানোই আরব বিশ্বের বলশেভিকদের জন্য একমাত্র পথ এবং সফলতম উপায়। [দেখুন : আশ-শুয়ুইয়্যাহ ওয়ালিদাতুল সাহয়ুনিয়্যাহ, আহমদ আবদুল গফুর আল-আত্তার]

জাতিসঙ্ঘের হলঘরে ফিলিস্তিনকে বণ্টন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়—রাশিয়া তখনো বণ্টনের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় তার মত করে নি—আরব কমিউনিস্টরা বণ্টনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু রাশিয়া ওই সিদ্ধান্তকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন জানানো ও দৃঢ়ীকরণের পর আরব কমিউনিস্টরাও তাদের বোল পাল্টে ফিলিস্তিনের বণ্টনে জোর সমর্থন জানাতে থাকে। আরব কমিউনিস্টদের মহাসচিব খালিদ বাকদাশ তাঁর মত ঘোষণা করেন এই বলে : 'আরবের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলোকেই জবাবদিহি করতে হবে। তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুহৃদ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করেছে এবং তার প্রতি বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেয় নি। এটা সত্য যে ইহুদিরা বিশাল কোনো জাতি নয়; কিন্তু তারা একটি গোষ্ঠী, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।' [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৭০]

লেবানন-সিরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য রফিক রেজা তথ্য ফাঁস করেন এবং বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব হাম্মাস বিন গুরিয়নের মতো ব্যক্তিদের হাতে ছিলো ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্রের উত্থানের

জন্যই। তাদের দৃষ্টিতে ইসরাইল নিকটপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের একটি মরূদ্যান। আর বাস্তুচ্যুত ইসরাইলি জাতির জন্য তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে আসার কোনো বিকল্প নেই। উল্লিখিত নেতৃত্বের দৃষ্টিতে আন্তরাষ্ট্রীয় সংহতির দায়িত্ব-কর্তব্য মার্কসবাদী চিন্তাধারার ঔরস থেকে জারিত। আর এটাই কারণ যে, তাদের দৃষ্টিতে ইসরাইলের অস্তিত্বের রয়েছে মানবিক যৌক্তিকতা যা জাতিগত যৌক্তিক কারণসমূহ ও ঘটনাবলিকেও ছাড়িয়ে যায়।

নিজেদের ভ্রাতৃবৃন্দের অনুকূলে—যারা তাদেরই গোত্রীয় ও দলীয় সন্তান—কমিউনিজমের লজ্জাজনক অবস্থান সম্পর্কে সব মানুষই অবগত রয়েছেন। কমিউনিস্টরা বাস্তুচ্যুত আরবদেরকে—যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, জীবন, ধর্ম ও ধন-সম্পদ বাঁচাতে লড়াই করছিলো—একই ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করে। তারা এই আরবদের বিরুদ্ধে আক্রমণে অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে অত্যাচারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা ইহুদিদেরকে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করে এবং ফিলিস্তিনের আত্মরক্ষামূলক লড়াইকে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৭১]

ইরাকে কমিউনিস্টরা বলে, 'ইরাকি জাতি ভ্রাতৃপ্রতিম ইসরাইলি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চূড়ান্তভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।' [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৭১ ও তার পরবর্তী]

ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির সচিব ইউসুফ সালমান (উপাধিনাম ফাহাদ) বলেন, 'ফিলিস্তিনে একটি আরব ও একটি ইহুদি দুটি রাষ্ট্র গঠন করাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। তাদের উভয়ের জন্য সমাজতন্ত্র এবং আরব ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে মৈত্রীবন্ধনের শর্তারোপকেও আমরা অভিনন্দন জানাই।'

মিসরি সাম্যবাদী সংস্থা ১৯৪৮ সালের ১৫ ই মে 'আরব দেশগুলোর সেনাবাহিনী ফিলিস্তিন আক্রমণ করেছে' শিরোনামে লেখে : এই যুদ্ধ একটি প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধ, যা ফিলিস্তিনের বিপ্লবী ক্রমঅগ্রসরমান (ইহুদি) প্রলেতারিয়েতদের দমন করতে আরব বুর্জোয়াদেরকে সহায়তা করেছে।' [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৭১]

ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কমিউনিস্টরা তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে আহ্বান জানায়। কমিউনিস্টরা তখন ইসরাইলি কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব

স্যামুয়েল ম্যাকুনিসের প্রবন্ধগুলো ধারাবাহিকভাবে বিলি করতো। স্যামুয়েল ম্যাকুনিস তাঁর এই প্রবন্ধগুলো কমনুফ্রম পত্রিকায় 'চিরশান্তির পথে' শিরোনামে প্রকাশ করতেন।

জর্ডান কমিউনিস্ট পার্টির সচিব ফুয়াদ নাসসার ১৯৫৭ সালে জাফারে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তিনি এই ভাষণে বলেন, 'নিশ্চয় আমরা জানি এবং সবাই জানেন যে ইসরাইল একটি বাস্তব বিষয় এবং একটি রাষ্ট্র, যার রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক অস্তিত্ব। আর ইহুদিরা অন্য জাতিগুলোর মতোই একটি জাতি। তাদের জীবন ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এবং আমি ইহুদিদেরকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করি; কারণ চালুনি দিয়ে সূর্য ঢেকে রাখা যায় না।' [দেখুন : হাযিহিশ শুয়ুইয়্যাহ, আবদুল হাফিয মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা ৮৮]

ফিলিস্তিনে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর এবং তার প্রত্যাবর্তন তীব্র হওয়ার পর কমিউনিস্টরা চুপে চুপে তার মধ্যভাগে প্রবেশ করে এবং তাদের 'ইহুদি ও জায়নিস্টের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ' শিরোনামের নিবন্ধের মাধ্যমে আহ্বান জানাতে শুরু করে। ফিলিস্তিন-সমস্যা দ্রবীভূত করার জনই তারা এটা করেছিলো।

তারা বলে, 'আমরা সম্মানিত ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না; আমরা লড়াই করবো জায়নিজমের বিরুদ্ধে।'

আমরা ঠিক বুঝি না, সাধারণ ময়দানে কীভাবে আমরা কমিউনিস্টদের দাবির প্রেক্ষিতে সম্মানিত ইহুদি (?!) এবং জায়নিস্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবো, যেখানে জায়নিস্ট সংগঠনগুলোর নেতারা প্রত্যেক জায়নিস্টকেই ইহুদি গণ্য করেন। বরং পবিত্র নগরী আল-কুদসের (জেরুজালেমের) দক্ষিণ অংশকে (অর্থাৎ ইয়াবুসিয়্যিন পাহাড়কে) সিহ্য়ুন[৫৭] বলা হয়। এরপর ইহুদিরা সিহ্য়ুন শব্দটিকে আল-কুদসের প্রতি আরোপ করতে শুরু করেছে তার নাম দিয়েছে সিহ্য়ুনের কন্যা (ابنة صهيون)। তাওরাতে রয়েছে : 'হে সিহ্য়ুনের কন্যা, গান গাও; উল্লাস করো, হে জেরুজালেমের কন্যা।' [দেখুন : জুয়ুরুল বালা, আবদুল্লাহ আত-তাল, পৃষ্ঠা ১৪১; যাকারিয়া, ২ : ১০ থেকে উদ্ধৃত]

---

[৫৭] জেরুজালেম বা পবিত্র নগরী আল-কুদসের যে-পাহাড়ে সুলাইমান আ.-এর প্রতিমূর্তি, মাসজিদুল আকসা ও পাথুরে শিখর রয়েছে তাকেই সিহ্য়ুন বলা হয়। (আল-মুনজিদ) সিহ্য়ুন শব্দ থেকে সিহ্য়ুনি বা জায়নিস্ট শব্দের উৎপত্তি।

থিওডর হার্জেল বলেন, 'জায়নিজম মানেই প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রত্যাবর্তন ঘটার পূর্বে ইহুদি ধর্মের (ইহুদিবাদের) প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তন করা।' [দেখুন : আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, যুহদি আল-ফাতেহ, পৃষ্ঠা ১৮৬]

ইসরাইলি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড বিন গুরিয়ন বলেন, 'আমি প্রথমে একজন ইহুদি এবং তারপর একজন ইসরাইলি; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে গোটা ইহুদি জাতির জন্য এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।' [দেখুন : আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া, যুহদি আল-ফাতেহ, পৃষ্ঠা ১২৩]

তারা (কমিউনিজমপন্থীরা ফিলিস্তিনের) তরুণ ও যুবকদেরকে বিপ্লবী সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সভ্য করে তুলতে শুরু করলো! এটা হলো মাও সেতুং ও চে গুয়েভারার সংস্কৃতি। এটা লেনিন ও স্ট্যালিনের সভ্যতা। এটা কার্লমার্কসের চিন্তাধারা এবং ফিদেল কাস্ত্রোর জীবনপদ্ধতি। তারা যুবকদেরকে বিশটি পরিভাষার শিক্ষাদান করে, যুবকেরা এই পরিভাষাগুলোর চারপাশে ঘোরপাক খেতে থাকে... সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়াশ্রেণি, demagogy[58], প্রলেতারিয়েতশ্রেণি, সর্বহারা...।

তরুণ-যুবারা ভাবলো যে তারা একটি নতুন জিনিসের মালিক হলো—আল্লাহ তাআলার দীনের পরিবর্তে তারা এটি গ্রহণ করলো; তারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিকিয়ে দিলো। যুবকেরা চিন্তার গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেলো। ফিলিস্তিনের ভূমি ও পবিত্র বস্তুসমূহ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও আল্লাহর পথে লড়াই প্রতিক্রিয়াশীলতা (দীনে ইসলাম)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রূপান্তরিত হলো—রূপান্তরিত হলো এক অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে, যা ছড়িয়ে পড়লো প্রতিটি ঘরে, ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে, পুত্র ও পিতার মধ্যে এবং কন্যা ও মায়ের মধ্যে।

কমিউনিজমপন্থী আল-আনসার সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ—এই সংগঠনটির নাম আমরা কাগজপত্র ছাড়া আর কোথাও শুনি নি—১৯৬৯-১৯৭০ সালে বিভিন্ন সমিতি ও সংঘের সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালো এবং বললো, 'আমাদের শত্রু কেবল জায়নিস্ট (ইহুদিবাদী) সাম্রাজ্যবাদ, সম্মনিত ইহুদিরা আমাদের শত্রু নয়!!'

---

[৫৮] demagogy : ক্ষমতা ও রাজনৈতিক মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাবাজির মাধ্যমে সাধারণ জনতার আবেগ, ভয়, সংস্কার, বঞ্চনাবোধ জাগিয়ে তোলা এবং তাদের উত্তেজিত করা; জনতার মনমাতানো বক্তৃতার রীতিনীতি; লোকখেপানো বক্তৃতাবাজি। এই বৃত্তিতে দক্ষ ব্যক্তিকে বলা হয় Demagogue বা বক্তৃতাবাজ।

বিপ্লবপন্থী দলগুলো ১৯৭০ সালের ১০ই এপ্রিল লেনিনের জন্মশতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে আম্মানে রাজধানীর তত্ত্বাবধানে পুরো এক সপ্তাহব্যাপী সমাবেশ করে। এমন কোনো সড়ক-বিভাজক, দরজা, ফটক, মুদী দোকান, বিপণিবিতান বাকি ছিলো না যেখানে তারা মহান (!!!) লেনিন—ভূপৃষ্ঠে নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্গাতা-এর ছবি এঁটে দেয় নি।

আমরা তাদেরকে তাদের ঘাঁটিগুলোতে কাছ থেকে দেখেছি। তাদের রয়েছে বৈপ্লবিক ও তৎপরতামুখর নাম : আবু জাহল, আবু লাহাব, মাও সেতুং, চে গুয়েভারা, হো চি মিন।

তাদের কাছে রাতের তাৎপর্য হলো : দীন-ধর্ম ও আল্লাহর উদ্দেশে গালিগালাজ করা, ভর্ৎসনা করা। আর তাদের খাবার হলো : তারা তাদের বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে কুকুর শিকার করতো এবং কুকুরের মাংস খেতো। তাদের কাছে কুকুরের মধ্যে আর মেষশাবকের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো না। কারণ, তাদের কাছে কুকুর ও মেষশাবকের মধ্যে পার্থক্যের দাবি করা এক ধরনের কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতা—একজন আরব মরুভূমিতে এই কুসংস্কারের প্রবর্তন করেছেন, তাঁর নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আমরা তাদেরকে দেখেছি, যখন মুসলিম মুজাহিদ যুবকেরা গেরিলাদের সমাবেশে অস্ত্র বহন করে আজান দিতো, তখন লেনিন, মাও সেতুং-এর সন্তানেরা আজে-বাজে কথা বলতো এবং এই চিৎকার করতো এই বলে :

إن تسل عني فهذي قيمي   أنا ماركسي لينيني أممي

'তুমি যদি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, তাহলে (জেনে রাখো), এটাই আমার মূল্যবোধ : আমি মার্কসবাদী লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদী।'

আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন—

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

'তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান করো তখন তারা এটাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তা এইজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।' [সুরা মায়িদা : আয়াত ৫৮]

যেসব মুসলিম মুজাহিদ যুবক ইসরাইলের কারাগারে শেকলবন্দি ছিলো, তারা যখন নামাযে দাঁড়াতো, তীব্র শোরগোলের শিকার হতো। জর্জ হাবাশ ও নায়াফ হাওয়াতমাহর কর্মীরা এই শোরগোল সৃষ্টি করতো। একজন মুসলিম যুবক মাও সেতুং বা চে গুয়েভারা বা লেনিন বা মার্কসের সমালোচনা করায় কী পরিমাণই না বিরোধিতা ও যন্ত্রণার শিকার হয়েছে।

জর্ডানে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটার পর আমরা কতিপয় বামপন্থী নেতাকে দেখলাম, যেমন জর্জ হাবাশ, গণতান্ত্রিক দক্ষিণ ইয়ামানে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করছেন—এটা অভিশপ্ত আদ সম্প্রদায়ে ভূমি—এবং মাও সেতুং, মার্ক ও লেনিনের অনুসারী গোষ্ঠী ও চুক্তিবদ্ধদের সংগঠিত করছেন।

আমি আশ্চর্য হলাম যে, ইংরেজরা কীভাবে আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারক ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তারা একই জোট, যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নিবেদিত।

ইংরেজরা কমিউনিস্টদেরকে ইয়ামানে তাদের কাস্তে ও হাতুড়ি উঁচু করে ধরতে শক্তিশালী করে তোলে এবং আরব জাতীয়তাবাদের নেতৃবৃন্দের অগ্রভাগ বিন্যস্ত হয় জর্জ হাবাশের মত ব্যক্তিদের দ্বারা, যাঁর নামটি পর্যন্ত আরবি নয়। তারা এটা এ-কারণে করে, যাতে ইয়ামানের মুসলিম জাতিকে স্বভাবগতভাবেই ভীতসন্ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা যায়, উত্তর ইয়ামানে বোমা ও বিস্ফোরক পাঠিয়ে ওখানকার প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করে দেয়া যায় এবং শিশু ও মেয়েদেরকে হত্যা করা যায়।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাত্রাগুলো অনুধাবন করা যায়। ইসলামি মূল্যবোধ এবং আখলাক ও শিষ্টাচার—এসবের কোনো বালাই-ই নেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের কাছে। কী পরিমাণ তাদের বান্ধবী! ফিলিস্তিনের নামে তারা বিপথগামী হয়েছে এবং প্রতারিত হয়েছে। আপনি যদি তাঁদের ঘাঁটিগুলোতে প্রবেশ করেন, বিশেষ করে, তাদের শহরের কার্যালয়গুলোতে যদি যান, যেমন আম্মান, শর্ট ট্রাউজার-পরা তরুণীদের ওখানে পাবেন, তারা বাদ্যযন্ত্রের গুনগুনানির ওপর ঘুমায় এবং বাদ্যযন্ত্রের তারের ওপর জেগে ওঠে, তারা বিটলস ও হিপ্পিদের দলগুলোর মধ্যেই থাকে।

১৯৭৯ সালে জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিক্ষোভ মিছিলে এদের আওয়াজ উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলো; তারা বলছিলো, 'আমাদের নীতিসম্মত দাবি : রুটি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং তরুণের পাশে তরুণী।'

আমি দেখলাম, একজন যুবক তাদের কাছে এগিয়ে গেলো, তাদের মধ্যে তখন আঞ্চলিক শ্লোগান ধ্বনিত হচ্ছিলো। এই ভালো যুবকটি তাদেরকে বললো, হে আমার ভাইয়েরা, আমি তোমাদেরকে ইসলামের নামে আহ্বান জানাই। তখন তাকে তাদের এক প্রতারিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী বন্ধু বললো, 'আমাদের যা দাবি তা স্পষ্ট; প্রতিক্রিয়াশীলতা, তার প্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না।' অর্থাৎ আমরা ইসলাম দেখতে চাই না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাত্ত্বিকভাবে ও প্রায়োগিক দিক থেকে মার্কসবাদের পতন

মার্কসবাদী তত্ত্বের বিষয়ে মীমাংসা করার সময় এসে গেছে।

প্রথমত, মার্কসবাদ গ্রন্থের উদরে সীমাবদ্ধ একটি তত্ত্বের বেশি কিছু ছিলো না এবং এভাবে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, লেনিন সে-তত্ত্বকে শব্দ ও বাক্য থেকে তুলে নিয়ে আসেন এবং মানুষের পিঠের ওপর বোঝার মত চাপিয়ে দেন।

দুটি দিক থেকে এ-বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে :

১. মার্কসবাদী তত্ত্ব
২. বাস্তব জগতে বলশেভিক বিপ্লব

প্রথম আলোচনা : মার্কসবাদী তত্ত্বের পর্যালোচনা

যখন মার্কসবাদের গ্রন্থগুলোকে মিথ্যাচার ও প্রতারণার দায়ে রাস্তায় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন থেকেই আল্লাহ একে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কসের সমসাময়িক ডেনিশ দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) মার্কসবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। তিনি 'জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে বন্ধন'-এর দর্শনের জনক। ফরাসি দার্শনিক হেনরি-লুইস বার্গসন (১৮৫৯-১৯৪১)[৫৯]-ও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। বার্গসন সমকালীন দর্শনশাস্ত্রে আত্মা-সংক্রান্ত দর্শনের প্রবক্তা। জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬)-ও মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তিনি Being and Time (সত্তা ও সময়) দর্শনের জনক।

মার্কসবাদের মিথ্যা ও প্রতারণাকে যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে আছেন জার্মান দার্শনিক শিলার (১৮৭৪-১৯২৮)। তাঁর দর্শন দাঁড়িয়ে আছে ধর্মচিন্তা, অধিবিদ্যা বাস্তবচিন্তা এবং সামাজিক জীবন, জ্ঞানগত জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে যে-বন্ধন তার

---

[৫৯] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত। তিনি ১৯২৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ওপর। তাঁর দর্শন ব্যাখ্যা করে যে চারিত্রিক মূল্যবোধ হলো দৃঢ়মূল বাস্তবতা। [দেখুন : আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস, মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ১৫৩]

কার্ল মার্কসের প্রতি সমালোচনার যেসব তীর ছোঁড়া হয় তা নিম্নরূপ :

১. যাঁরা কার্ল মার্কসের তর্কবিতর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন তাঁরা দেখেছেন, তিনি এটিকে হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। দ্বন্দ্বতত্ত্ব, পরম ভাব, আত্মজ্ঞান ইত্যাদি যেসব অভিধা হেগেল ব্যবহার করেছেন তার সবগুলো বস্তুনিরপেক্ষ, কল্পনাজাত এবং বিতর্কমূলক; বাস্তব জগতে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব বা ভিত্তি নেই।

২. কার্ল মার্কসের পূর্বে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন ফরাসি দার্শনিক পল হলবাখ (১৭২৩-১৭৮৯) এবং ডাচ দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭); শ্রেণিসংগ্রাম নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫); অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন সিসমন্দি (১৭৭৩-১৮৪২); প্রলেতারিয়েতদের একনায়কতন্ত্র নিয়ে লিখেছেন বেব্যেফ (১৭৬০-১৭৯৭); উদ্বৃত্ত মূল্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন ফরাসি দার্শনিক ও সামজবিজ্ঞানী শার্ল ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭)। [দেখুন : আত-তাফসিরুল ইসলামিয়্যু লিত-তারিখ, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল, পৃষ্ঠা ৬৫; তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ৭৮]

রোগার গারাউডি (১৯১৩-২০১২)—সমকালীন মার্কসবাদী ফরাসি দার্শনিক। মার্কসবাদের সমালোচনা করে অনেককিছু লিখেছেন, যদিও তিনি তখন কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। কমিউনিজমের সমালোচনা করে লেখালেখির পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।—বলেন, 'ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক আলজেরিয়া হেগেল বা রিকার্ডো বা সেন্ট সাইমনের প্রদর্শিত পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করে তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারতো। তার ছিলো বৌদ্ধিক ও দ্বান্দ্বিক উত্তরাধিকার, যা ইবনে রুশদের দর্শনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো এবং তার কাছে ছিলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুসংবাদদাতা যিনি ইবনে খালদুনের ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে

উঠেছিলেন; সে এই উত্তরাধিকারের ওপর ভিত্তি করে তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।' [Marxism in the Twentieth Century, Roger Garaudy (১৯৭০), আরবি অনুবাদ : নাযিহ্ আল-হাকিম, পৃষ্ঠা ৫১। আমরা লেখকের এই ভাষ্যকে উদ্ধৃত করেছি, যদিও আমরা তাঁর মূল বক্তব্যকে গ্রহণ করি না এবং মানি না। কারণ, একজন মুসলমানের পক্ষে নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের দিকে ছুটে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবনে রুশদের লিখিত পরস্পরবিরোধী দার্শনিক বিশৃঙ্খলার পথেও একজন মুসলমানের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর আমরা লেখকের সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত নই যে ইবনে খালদুন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।]

এর অর্থ এই নয় যে তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। কার্ল মার্কসই ছিলেন তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রের বাজারজাতকারী। রোগার গারাউডি তাঁর গ্রন্থে কমিউনিস্টদের প্রতি বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন একটি প্রশ্নের : তোমরা কেনো মুসলমানদের ওপর কার্ল মার্কসের নাস্তি কতাকে চাপিয়ে দিতে চাও? তিনি তো ফরাসি সমাজতন্ত্র, হেগেলের দর্শন এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতির সমন্বয়ে তাঁর সমাজতন্ত্রকে প্রণয়ন করেছেন। এই শেষ বাক্যটি মূলত লেনিনেরই বাক্য।

৩. কার্ল মার্কস মনে করেন বস্তু, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং উৎপাদনের নানান হাতিয়ারের গুরুত্বের সামনে মানব-বুদ্ধির কোনো মূল্য নেই। কিন্তু আমরা বলি : মানব-বুদ্ধিই শক্তির উৎস ও উন্মেষ। মানব-বুদ্ধির কল্যাণেই বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, উৎপাদন-পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ঘটেছে এবং বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে।

কার্ল মার্কস বলেন, হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী চিন্তার সক্রিয়তা ও তৎপরতাই (পরম ভাব) বাহ্যজগতের স্রষ্টা । [দেখুন : তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ৯৮; দিরাসাতুন ইসলামিয়্যাহ, সাইয়িদ মুহাম্মদ কুতুব, পৃষ্ঠা ৩২] কিন্তু আমি বলি : চিন্তা বস্তুজগৎ ছাড়া কিছু নয়; কারণ, মানব-মস্তিষ্ক এটিকেই প্রতিফলিত করে। মানুষের ভাব ও অনুভূতি তাদের অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত ও নির্ধারিত করে নি; বরং মানুষের অস্তিত্বই তাদের ভাব ও অনুভূতিকে সংজ্ঞায়িত ও নির্দিষ্ট করে। হেগেলের 'পরম ভাব'-এর তত্ত্বকে মেনে নিয়ে কার্ল মার্কস যা বলেছেন তা মানব-সত্য সম্পর্কে এক চরম অজ্ঞতা।

৪. কার্ল মার্কস মনে করেন, পৃথিবীতে যে-কোনো ধরনের পরিবর্তন বস্তুত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যিক পরিণতি। কিন্তু আমরা বলি : উৎপাদন-যন্ত্র ও -ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো যখন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুলরূপে প্রেরণ করা হয়েছিলো? তিনি যে পৃথিবীর ইতিহাসে বিশাল পরিবর্তন সূচিত করেছিলেন তা কি উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফল ছিলো? অর্থনীতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থাই কি উইলিয়াম শেক্সপীয়ার, দান্তে আলিগিয়েরি, ইউহান্না ক্যালভিন, শার্ল দো মন্টেস্কু ও মার্টিন লুথার কিং-এর মত ব্যক্তিত্বদের জন্ম দিয়েছিলো? ইসলামি আন্দোলনের সন্তান ও আলেম-উলামার নেতৃত্বাধীন আফগান জাতির জিহাদের ঘটনাবলিকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো যেখানে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের যুক্তি দাবি করে যে এসবকিছু ঘটবে সমাজতান্ত্রিক বামপন্থা অনুযায়ী? তাহলে সেখানে কীভাবে ইসলামের পতাকা উড্ডীয়মান হলো? যা কার্ল মার্কসের কাছে প্রতিক্রিয়াশীলতা!

৫. কার্ল মার্কস মনে করেন, যে-কোনো যুগের এবং তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিন্তা মূলত সেই যুগের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ফল। এর অর্থ দাঁড়ায় : উনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্কসের যে-চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে তা ওই সময়ের অর্থনীতির ফল। মার্কসের পর অর্থনীতির জগতে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; সুতরাং বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলোকে এসে মার্কসের চিন্তাধারা প্রতিক্রিয়াশীলতা, পুরাতন ও জরাগ্রস্ত হিসেবেই বিবেচিত হবে।

৬. মার্কসবাদ যাবতীয় মানবিক সমস্যার জন্য একটি মাত্র চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করে। এটি ভয়াবহ প্রতারণা। এটি ওই মূর্খ হাতুড়ে ডাক্তারের মতো যে তার কাছে বিভিন্ন ধরনের ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে আসা রোগীদেরকে একটি মাত্র ওষুধ—প্যারাসিটামল প্রদান করে।

৭. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস অত্যন্ত প্রাচীন দলিল-প্রমাণ ও সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করেছেন। টমাস মরগান আরকাবি গোত্রসমূহ-সম্পর্কিত গবেষণায় সেসব দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। জার্মানির কৃষিনির্ভর গোত্রসমূহকে নিয়ে জর্জ ভন যে-গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতেও এসব দলিল-প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য ও দলিলের ভিত্তি নেই; এমন কি ঐতিহাসিকভাবেও সেগুলোকে যথার্থ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ এসব গোত্রের বসবাস ছিলো খ্রিস্টপূর্ব যুগে। কার্ল মার্কস যেসব

দৃষ্টান্তের ওপর নির্ভর করেছেন তার একটির উদাহরণ : যেসব যাযাবর গোত্র শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো তারা নারীকে খুবই তুচ্ছ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কারণ নারী তখন কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। শিকারনির্ভর যাযাবর যুগে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান ছিলো না বলেই তাদেরকে হেয় ও তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হতো।

কিন্তু মার্কসের এই বক্তব্য বাস্তববর্জিত। কারণ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে নারী ছিলো অত্যন্ত সম্মানীয় স্থানে। [দেখুন : আত-তাফসিরুল ইসলামিয়্যু লিত-তারিখ, ড. ইমাদুদ্দিন খলিল, পৃষ্ঠা ৫৭; তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ৯৮-১০০] অথচ কৃষিভিত্তিক রোম সাম্রাজ্য ও জার্মানিতে আইনগত দিক থেকে নারী ছিলো দাসত্বের স্তরে।

৮. কার্ল মার্কস মনে করেন, ধর্ম মূলত পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সেবক। কিন্তু তাঁর এই উক্তি যথার্থ নয়। তাঁর কথা যদি সত্যিই হতো, তাহলে কীভাবে আফগানিস্তানে বাদশাহ মুহাম্মদ জহির শাহ-এর বিরুদ্ধে, তারপর ধর্মনিরপেক্ষ মুহাম্মদ দাউদ খানের বিরুদ্ধে, তারপর নুর মুহাম্মদ তারাকি, হাফিজুল্লাহ আমিন, বাবরাক কারমাল ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধর্ম বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অবশেষে রাশিয়াকে পরাজিত করেছে?

৯. মার্কস বলেন, উৎপাদনের হাতিয়ারের পরিবর্তন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকেও আবশ্যক করে। কিন্তু আমেরিক ও ইউরোপের বাস্তব চিত্র তাঁর দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে আমেরিকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষে পৌঁছেছে, অথচ তার সমাজব্যবস্থা অটুট আছে।

১০. মার্কস বলেন, যে-কোনো যুগে চরিত্র ও শিষ্টাচার উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিফলন। উৎপাদনব্যবস্থা ধারাবাহিক অগ্রগতির রেকর্ড; তেমনি চরিত্র ও শিষ্টাচারও ধারবাহিক অগ্রগতির রেকর্ড। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পশুত্বেরও নিম্নস্তরে পৌঁছে গেছে এবং তারা কদর্য পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত; চারিত্রিক ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিক অধঃপতনই ঘটেছে। এসব লক্ষণ মার্কসের বক্তব্যকে অস্বীকার করে।

১১. মার্কস তাঁর চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে প্রত্যাশা করেছেন যে, ব্রিটেন ও জার্মানির মতো অধিকাংশ দেশেই শিল্পের অগ্রগতির ফলে সাম্যবাদী বিপ্লব (Communist Revolution) সংঘটিত হবে। কিন্তু সাম্যবাদী বিপ্লবের ফলে

ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই পশ্চাদ্পদতার সৃষ্টি হয়েছে; বরং কোথাও জমিদারি ও সামন্তরাজ্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তা রাশিয়া। আর চীনে শিল্পের অগ্রগতির স্তর অতিক্রম করা ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

১২. মার্কসের মত অনুসারে 'সাম্যবাদী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সময় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের অনুশীলনের সমাপ্তি ঘটবে'-এর তত্ত্ব এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবৃত্তি ও কল্পনা এবং তা কোনো জ্ঞান নয়। এ-কারণেই আমি বলি : মার্কসবাদী চিন্তাধারা মূলত জীবনের জন্য 'তাওরাতীয় ব্যাখ্যা' এবং মানবজাতির জন্য 'তালমুদীয় চিন্তা'। যেসব ইহুদিরা স্বর্ণ-নির্মিত গো-বৎসের পূজা করতো তারা আবারও দার্শনিক চিন্তাধারা ও জ্ঞানের ছাঁচে গো-বৎস নির্মাণ করতে শুরু করে। মানবজাতির প্রতি ইহুদিদের তালমুদীয় বিদ্বেষ তাদের ক্রোধের পেয়ালাকে উপচে দিয়েছে এবং মানবতার প্রতি তাদের রোষ ও ঘৃণার গরল শ্রমজীবী মানুষের উদ্ধার ও সর্বহারাদের মুক্তির জন্য লেলিহান কথামালার মধ্য থেকে গড়িয়ে নেমেছে। সত্য হলো, কার্ল মার্কস নিজেই জানতেন যে, তাঁর চিন্তাধারা জীবন ও বাস্তবতার কুচকাওয়াজের সঙ্গে পেরে উঠবে না। যেমন : বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর জামাতার উদ্দেশে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'সব অবস্থায় আমি সেটির [মার্কসবাদ] প্রতি আস্থাবান নই : আমি, স্বয়ং আমি, মার্কসবাদী নই।' [দেখুন : আল-ইনহিদারুল মার্কসি ফিল আলামিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২৮; আল-ফিকরুল ইসলামিয়্যুল হাদিস ওয়া সিলাতুহু বিল-ইসতি'মারিল গারবিয়্যি, ড. মুহাম্মদ আলবাহি]

১৩. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের রচনারাশির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়নকারী সেগুলোতে পুঁজিবাদের পতন ও বিপ্লব-পরবর্তী সমাজের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না। তাঁরা দুজন আপনাকে তড়িৎগতিতে বিপ্লবের বিজয় থেকে রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের স্তরে নিয়ে যাবেন। এ-কারণেই র‍্যামন্ড অ্যারন[৬০] যথার্থই ছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, 'জ্ঞানগত সমাজতন্ত্র সর্বপ্রথম ও সবকিছুর পূর্বে পুঁজিবাদের সমালোচনামূলক চিন্ত

---

[৬০] কলেজ ডি ফ্রান্সের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক র‍্যামন্ড অ্যারন ১৯০৫ সালের ১৪ই মার্চ প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৩ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বাবা ছিলেন স্যাকুলার ও ইহুদি আইনজীবী। র‍্যামন্ড অ্যারন্ডের রচিত গ্রন্থ চল্লিশটিরও বেশি।

াধারা...এটি এমন মতাদর্শ, তাতে আপনি এই ব্যবস্থার ব্যাখ্যামূলক বৈশিষ্ট্য বৃথাই খুঁজবেন, অথচ তা পুঁজিবাদি ব্যবস্থার পরবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি রাখে।' [দেখুন : Marxism in the Twentieth Century, Roger Garaudy (১৯৭০), পৃষ্ঠা ২৩; আর আরবি কথাটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে من ماركس إلى ماوتسي تونغ، مائة عام من الدولة الماركسية 'মার্কস থেকে মাও সেতুং : মার্কসবাদী রাষ্ট্রের একশো বছর' গ্রন্থ থেকে।]

১৪. কমিউনিস্টরা কমিউনিজমের নামকরণের ক্ষেত্রে 'লেনিনবাদী মার্কসবাদ' বলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যেনো সে-দুটি একই কথা এবং দুটির গঠন একই। কিন্তু যিনি লেনিনের ১৯০২-সালের-পরে-বলা কথাবার্তা এবং ভাষণ ও বক্তৃতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, তাঁর কথা এবং কার্ল মার্কসের কথার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান এবং ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ ১৯০২ সালের পর এবং তাঁর What is to be done? (১৯০২) গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর লেনিনের চিন্তাধারা পাল্টে যায়। তাঁর রচনায় খুনী চিন্তারাশির প্রকাশ ঘটে এবং তারপর স্ট্যালিন সে-চিন্তারাশির বাস্তব ও জীবন্তরূপ প্রদান করেন : সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্রের (dictatorship of the proletariat) ছায়ায় শ্রেণিসংগ্রামে রক্ত ও লাশের নদী বয়ে যায়। এ-কারণেই লেনিনের চিন্তারাশি আর মার্কসের চিন্তারাশি এক নয়; ভিন্ন ভিন্ন। [দেখুন : Marxism in the Twentieth Century, Roger Garaudy (১৯৭০), আরবি অনুবাদ : নাযিহ আল-হাকিম, উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে আরবি অনূদিত গ্রন্থ থেকে।]

কার্ল মার্কস যে-গণতন্ত্রের আহ্বান জানিয়েছিলেন, লেনিনের চিন্তাধারায় তা হয়ে উঠেছে খুনী রক্তরঞ্জিত একনায়কতন্ত্র।

আলেক্সান্ডার গ্রে তাঁর 'অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে [পৃষ্ঠা ৩০৭] বলেন, 'এটা সম্ভব ছিলো যে, কোনো শাস্ত্র মার্কসের মতো ব্যক্তিত্ব নাও পেতে পারতো এবং এটাও সম্ভব ছিলো যে, মার্কস লেনিনের মতো ব্যক্তিত্ব নাও পেতে পারতেন। ইতিহাসের বিশ্লেষণ অনুসারে এটাই বিশুদ্ধ অভিমত যে, মানুষ বিনীত হয় এবং অধিকাংশ সময়ই অদৃশ্য বিষকে বোঝার ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট নয় বলে বিশ্বাস করে। এটা বোঝা উচিত যে, অনেকগুলো উপাদান মিলে মানবেতিহাসকে গঠন করেছে। অর্থনীতি সেসব উপদানের একটিমাত্র উপাদান ছাড়া কিছু নয়। এবং তা সবসময় সর্বাধিক

গুরুত্বপূর্ণও নয়।' [দেখুন : তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ৯৯-১০৪]

মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকারী ব্যক্তি মনে করেন, জাতি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে অর্থনীতিই একমাত্র কার্যকরী উপাদান নয়। এই ব্যক্তিটি হলেন জিডিএইচ কোল। তিনি বলেন, 'সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাঠামো নির্মাণের কার্যকরী উপাদানগুলোর মধ্যে একটি উপাদানমাত্র। যদিও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী উপাদান।' [দেখুন : তাফসিরুত তারিখ, আবদুল হামিদ সিদ্দিকি, পৃষ্ঠা ১২৩]

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর New Hopes for a Changing World গ্রন্থে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাবলির ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী চিন্তাধারার অসারতাকে কয়েকটি চরম উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। রাসেল বলেন, 'জার্মান সরকার কর্তৃক লেনিনের ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় ফিরে আসার অনুমতি প্রদান ছিলো মূলত হঠকারী সিদ্ধান্ত। যদি সেই বিশেষ মন্ত্রী 'না' বলতেন, এবং 'হ্যাঁ' না বলতেন—কার্যত তিনি 'হ্যাঁ'ই বলেছিলেন—তাহলে রুশ বিপ্লব[৬১] যে-পথ গ্রহণ করেছে, তার সে-প্রথ গ্রহণ করার চিন্তা করাও আমাদের জন্য কঠিন হতো।' [প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫]

ইতিহাসে কিছু চরম মুহূর্ত রয়েছে, যখন কিছু মানুষ তাদের নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করেছেন; তাঁরা হয়তো গোটা জাতিকে উদ্ধার করেছেন অথবা গোটা জাতিকে ধ্বংস করেছেন। হযরত আবু বকর রা. কর্তৃক রিদ্দার যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটি সেরকম একটি চরম মুহূর্ত। তিনি গোটা মুসলিম জাতিকে আসন্ন বিপদ ও বিনাশ থেকে উদ্ধার করেছেন, যা ছিলো অবশ্যম্ভাবী।

---

[৬১] ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার পেত্রোগ্রাৎ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ায় অনুসৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটি ছিলো ২৫ শে অক্টোবর। তাই একে অক্টোবর বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলো লেনিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু বল্‌শেভিক অংশ। এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণি ও সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে। বিপ্লবপরবর্তী সময়কাল ছিলো নানা দিক দিয়ে জটিল। যে-ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো তা দেশের ভেতর ও বাহির থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়।

আলেক্সান্ডার গ্রে মার্কসবাদী চিন্তাধারার পর্যালোচনায় চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'কার্ল মার্কস ছিলেন কল্পকাহিনি রচয়িতা। তাতে বাস্তব বিষয়গুলো ছিলো গৌণ। মার্কস যা বিশ্বাস করতে ভালোবাসতেন, তাঁর কল্পকাহিনি সেগুলোরই চিত্রাঙ্কন করেছে। তাঁর এই বিশ্বাসে এমন শক্তি রয়েছে যা অন্তরে কাজের প্রেরণা জোগায়। এই দর্শনগুলো তাদের সত্তাগত দিক থেকে বিশুদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এগুলো সংগ্রামরত জনমানুষের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে অবশ্যই একীভূত হয়ে গেছে।' [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ২৭]

দ্বিতীয় আলোচনা : মার্কসবাদী অনুশীলনের পতন এবং শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের পতন

বলশেভিক বিপ্লব বিভিন্ন কার্যকারণ ও উপাদান থেকে শক্তি অর্জন করে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছিলো। ধর্মীয় কট্টরপন্থী ও জারদের অত্যাচারে মানুষের জর্জরিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার জয়ী হওয়ার ফলে বলশেভিক বিপ্লব বেশ শক্তি আহরণ করেছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর পর যে-ভয়ঙ্কর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো তা থেকেও বলশেভিক বিপ্লব পুষ্টি লাভ করেছিলো। এ-সময়, ১৯২০ সালের শুরুর দিকে আমেরিকান ও ইংলিশ যুবকেরা জাজ যুগে (Jazz Age)[৬২] প্রবেশ করেছিলো। তারা রক্তের বদলে মদের বৈধতার ঘোষণা দিয়েছিলো। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যেসব মূল্যবোধ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো সেগুলোর অবক্ষয় ঘটেছিলো। মানুষ ভেবেছিলো, মার্কসবাদী দর্শনই ইউরোপের বিপুল জনগোষ্ঠীর আত্মিক শূন্যতা পূরণ করবে।

তিরিশের দশকে ফ্যাসিবাদ[৬৩] ও নাৎসিবাদ ভয়ঙ্কর অবস্থা ধারণ করলে মার্কসবাদ আরো চাঙা হয়ে ওঠে। লেখক ও সংস্কৃতিবান তরুণদের সামনে

---

[৬২] জাজ যুগ ১৯২০ শতকের একটি বৈশিষ্ট্য। এ-সময় জাজ মিউজিক ও জাজ ড্যান্স বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। এটা ছিলো মূলত The Great Depression বা চরম বিষাদের ফল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিলো।

[৬৩] ফ্যাসিবাদ ইংরেজি ফ্যাসিজম (fascism) শব্দের বাংলা। ১৯১৯ সালে ইতালিতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিলে এর পুরোধা বেনিতো মুসোলিনি ইতালির স্বৈরাচারী শাসনকর্তা (১৯২২-১৯৪৩) হন। ফ্যাসিবাদ ইতালিতে শুরু হলেও পরে তা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। একে স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার

বলশেভিক বিপ্লবের উদ্দেশে পলায়ন করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। কারণ, তখন বলশেভিক বিপ্লবই ছিলো একমাত্র শক্তি যা বর্বরদের সামনে দাঁড়াতে পারে। [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ২২, অনুবাদ : ফুয়াদ হামুদা। গ্রন্থটি ছয় জন বড় বড় পশ্চিমা চিন্তাবিদের কাহিনি বর্ণনা করেছে। তাঁরা কমিউনিজমকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন; কিন্তু পরে তারা তওবা করেন এবং তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

মানুষের রক্ত চোষার জন্য পাশ্চাত্যের যে-ক্ষুধা তা থেকে মার্কসবাদ ফায়দা হাসিল করে। কেবল দ্রব্যমূল্যকে ঊর্ধ্বে রাখার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার টন ফল ও শস্য এবং দশ হাজার শূকর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। আর এদিকে ক্ষুধা তার নখর বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের গলায় ফাঁস লাগায়। [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ১৫]

আর্থার কোয়েস্টলার[৬৪] এ-কথাই বলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিজয় থেকেও মার্কসবাদ পুষ্টি লাভ করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করে।

এইসব কার্যকারণ ও উপাদান—এগুলো ছাড়া আরো কার্যকারণ ও উপাদান রয়েছে—ইউরোপীয় যুবকশ্রেণিকে কমিউনিজমের কোলে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করেছিলো। এরপর তাদের সামনে কমিউনিজমের অলীক মায়াজাল উন্মোচিত হয় এবং তারা নিরাশাগ্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে আসে। সিলোনি এসব ক্ষুব্ধ কমিউনিস্টের মানসিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর বন্ধু টলকিয়ানিকে রসিকতা করে বলেন, কমিউনিস্টদের মধ্যে এবং যারা কমিউনিজম ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই হবে। [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ২৩০]

বিপ্লবের তিন বছরের মধ্যে যাঁরা মার্কসবাদী অনুশীলনের পতন আঁচ করতে পেরে এ-ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাঁদের একজন হলেন ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। এ-বিষয়ে তিনি তাঁর The Practice and Theory of Bolshevism গ্রন্থটি লেখেন। গ্রন্থটি প্রথম ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়।

মডেল হিসেবে জার্মানি, স্পেন ও জাপান। একনায়কতন্ত্রী শাসন যখন নিজের ক্ষমতার দম্ভে কোনো অন্যায় করতেই দ্বিধা করে না; অন্য রাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, ভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে নেয়, তখন তাকে 'ফ্যাসিবাদ' বলে শনাক্ত করা হয়।

[৬৪] আর্থার কোয়েস্টলার একজন হাঙ্গেরিয়ান-ব্রিটিশ লেখক ও সাংবাদিক। তিনি ১৯০৫ সালে বুদাপেস্টে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর এটি পুনর্মুদ্রিত হয়; কিন্তু একটি শব্দেরও পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ে নি।

কমিউনিজম থেকে যাঁরা নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়েছেন তাদের আর-এক উদাহরণ হলেন ফরাসি দার্শনিক আঁদ্রে জিদ। কমিউনিজমে ব্যাপারে আঁদ্রে জিদ ছিলেন উৎসাহী ও উত্তেজিত। তিনি মনে করতেন, মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সারবত্তা রয়েছে ওই স্বর্গেই।

আঁদ্রে জিদ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলতেন, 'এটি কেবল একটি চমৎকার ও তুলনারহিত দেশই নয়, অথবা ঐশী প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার স্থানই নয়; বরং তার থেকেও বেশি কিছু এবং শ্রেষ্ঠতম। শুরুতে আমার মনে হয়েছিলো যে, সবচেয়ে কঠিন বিষয়গুলো সম্পাদিত হয়েছে।' [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ২৩৬]

কিন্তু আঁদ্রে জিদ যখন ১৯৩৬ সালে রাশিয়ায় ভ্রমণে যান, তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তিনি হতাশাগ্রস্থ হয়ে কমিউনিজম থেকে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, 'গোটা বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যতীত আর একটি রাষ্ট্রও এমন আছে কি যেখানে আত্মা ও বুদ্ধি সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে কম স্বাধীনতা ভোগ করে এবং বেশি লাঞ্ছনা, দাসত্ব ও ভীরুতায় আক্রান্ত?' [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, নাহাদ আল-গাদেরি, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮।]

সব দিক থেকে কমিউনিজমের পতন ঘটে :

সমতা ও সাম্যের দিক থেকে পতন

কমিউনিস্টরা সমতা ও সাম্যের কথা বলেই শ্রমিকশ্রেণিকে ধোঁকা দিয়েছিলো। কত কত মানবপতঙ্গ কমিউনিজমের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সাম্যের আলোকচ্ছটায় আকৃষ্ট হয়। বলশেভিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর কমিউনিস্টরা মানুষের উদ্দেশে প্রথম যে-কথা বলে তাদের বক্তব্যের সূচনা করে তা হলো, সাম্য অসম্ভব। সাম্য শ্রেণিবিভাজনকে বিনষ্ট করে; অর্থাৎ এটি ক্ষমতার গদিতে পৌঁছানোর অন্তরায়।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে লেনিন বলেন, ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এক হাজার বার সঠিক কাজটি করেছেন যখন তিনি স্পষ্ট ঘোষণা

দিয়েছেন যে, সাম্যের প্রতিটি দাবি শ্রেণিভিজানকে মুছে দেয়ার জন্য যে-প্রতিরোধ তাকে শক্তিশালী করে। এটি বোধগম্যতার সীমানা থেকে বাইরে নির্বুদ্ধিতাজাত একটি ব্যাপার।' [দেখুন : আত-তারিখুস সিররি লিল-আলাকাতিশ শুয়ুইয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮ ।]

স্টালিন ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বোচ্চ স্তরের ও সর্বনিম্ন স্তরের শ্রমিকের মধ্যে পারিশ্রমিকের পার্থক্যের ব্যাপারগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করতে পারি। এদিকেই পথ হেঁটেছেন এঙ্গেলস, লেনিন এবং স্টালিন। পার্থক্যের এসব বিষয়ের দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় পশ্চিমা সমাজগুলোতে; ওখানেই পারিশ্রমিকের বৈষম্য তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই বৈষম্য কখনো দশগুণ, কখনো বিশগুণ কখনো বা তারও চেয়ে বেশি। [দেখুন : প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮ ।]

তাহলে শ্রেণিবিভাজন মুছে দেয়া ক্ষেত্রে পার্থক্যগুলো কোথায়? এখানে একটি শ্রেণি আছে, কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণি। তাঁর বেশ ভালোভাবেই জীবনযাপন করছে। কমিউনিস্ট পার্টি বাদে আর যেসব মানুষ আছে তাদের কোনো জীবন নেই; তারা অনাহার তাদের কণ্ঠনালীতে ফাঁস লাগিয়েছে, তারা দুর্দশাপীড়িত। আপনি যদি চান তাহলে যুগোস্লাভ লেখক মিলোভান ডগলাসের The Rulling Class বইটি পড়তে পারেন। বইটি পড়ে আপনি কমিউনিস্ট রক্তচোষাদের সম্পর্কে তিক্ত বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এই কমিউনিস্ট রক্তচোষারা মেঘের ওপর বাস করে আর সাধারণ মানুষ বাস করে মাটির অভ্যন্তরে। এই বইয়ের লেখক নয় বছর কারাদণ্ডের শাস্তি পেয়েছেন।

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দিক থেকে কমিউনিজমের পতন

কার্ল মার্কস মনে করেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া শ্রেণিকে খতম করার জন্য শুরুতেই প্রলেতারিয়েতের (শ্রমিক শ্রেণির) একনায়কতন্ত্র[৬৫] জরুরি।

---

[৬৫] Dictatorship of the Proletariat বা প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র হলো এমন একটি অবস্থা যখন প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণির হাতেই থাকবে রাজনৈতিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ। এটি পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন সরকার মালিকানাধীন সমস্ত বস্তুকে ব্যক্তিমালিকানা থেকে যৌথ মালিকানায় নিয়ে যাওয়ার

প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া শ্রেণিকে খতম করার পর ধীরে ধীরে শাসন ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রকাঠামোর বিলুপ্তি ঘটবে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ ছাড়াই তখন দেশ চলবে।

এ-কারণেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরকে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করার পথ অনুসরণ করেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একনায়কতন্ত্র এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন দিন দিন বেড়েই চলছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলোতে মানুষেরা মূলত লৌহ-কারাগারের অভ্যন্তরেই বসবাস করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ পাসপোর্ট থেকে বঞ্চিত। কোথাও যাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ। মানুষ যদি ওখানে ভ্রমণের স্বাধীনতা পেতো তাহলে তিন মিলিয়ন কমিউনিস্ট ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে আর কেউই থাকতো না।

গোটা জাতি ওখানে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর হাতুড়ি ও তাদের নীতিমালার নেহাইয়ের মধ্যে বসবাস করে। ১৯৪৫ সালে বার্লিন দুই খণ্ডে খণ্ডিত হয় : পশ্চিম খণ্ড থাকে পশ্চিমাদের শাসনাধীন এবং পূর্ব খণ্ড চলে আসে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাধীন। বার্লিনের দুই খণ্ডের মধ্যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। আপনি যদি এই প্রাচীরটি এবং তাতে যে-আলো ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখতেন তাহলে আশ্চর্য ও আতঙ্কিত বোধ করতেন। প্রাচীরের ওপর বৈদ্যুতিক তারের জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে; কেউ যদি এই জাল স্পর্শ করে তা তার কাছে যায় তাকে শক খেতে হয়। কত মানুষ এই প্রাচীরে ওপর বিদ্যুতের শক খেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তারা সাম্যবাদের নরক থেকে পশ্চিম বার্লিনে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলো।

পশ্চিমা পত্রিকাগুলো ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছে। এটি পূর্ব বার্লিন থেকে দুটি পরিবারের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুটি বেলুনে চড়েছে এবং পশ্চিম বার্লিনে উড়ে গেছে। ঘটনাটি মনে হয় কল্পনা; যেনো তা বাস্তব নয়। পলায়নপর মেধাবী ব্যক্তিবর্গ, সর্বক্ষেত্রের সাধারণ লোক, সর্বস্তরের মানুষ :

প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে। প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিবাদীদের উৎখাত করা, বিরুদ্ধ গোত্রগুলোকে খতম করা শ্রেণিবিভাজনকে বিলুপ্ত করা।

শিল্পী, নর্তকী, খেলোয়াড় সাংবাদিক ও লেখক—সবার জন্য পালিয়ে যাওয়ার একটি উপায় ছিলো রাজনৈতিক আশ্রয় (political asylum)। তাদের সবাই ছিলো প্রতিশোধপ্রবণ বিক্ষুব্ধ : কেবল লাল লৌহ-আচ্ছাদনের তালা খুলতে পেরে তারা হাঁফ ছাড়ছিলো।

বলশেভিক বিপ্লব তার দশ মিলিয়ন শত্রুকে নির্মূল করেছে। এরপর তার নিজের সৈনিকদেরকেই খতম করতে লেগেছে। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির তিন চতুর্থাংশ নেতাকে নির্মূল করা হয়েছে। ১৯৩৬ সালে জাতীয় পরিষদে ২১ জন ব্যক্তি ছিলেন। দুই বছর পর পাঁচজন ছাড়া তাদের আর কেউই জীবিত থাকেন নি; সবাইকে ধ্বংস করা হয়েছে।

১৯৩৮ সালে কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য ছিলেন ৭১ জন। সেই ১৯৩৮ সালেই তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ২১ জনে। অন্যদের অবস্থা হয়েছিলো বিভিন্ন রকম : ৩ জন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন; একজনকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিলো; ৩৬ জন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন; ৯ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিলো; মার্শাল আত্মহত্যা করেছিলেন। [দেখুন : আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যাহ ফি মাআকিলিল ইসলাম, আবদুল্লাহ আত-তাল, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অধ্যায়', পৃষ্ঠা ৪৬]

কোন্ মানুষটা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারছে? কোন্ মানুষটা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে পারছে বা নিজের পক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারছে? এ-ক্ষেত্রে চেকদের অভিজ্ঞতা আপনার জন্য যথেষ্ট। চেকোস্লোভাকিয়া যখন কমিউনিস্ট চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করতে চাইলো তখন সামরিক ট্যাঙ্ক ও বিমান হামলা চালিয়ে একদিনের মধ্যে তা দখল করে নেয়া হলো।

১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সচিব Ludvik Svoboda-এর শাসনামলে চারটি চেকোস্লোভাকিয়ান পত্রিকা সমালোচক ও গণতন্ত্রপন্থীদের একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। তাঁরা এই বিবৃতিতে নিম্নবর্ণিত পন্থায় কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করেন :

কমিউনিস্ট পার্টি একটি ক্ষমতাদর্পী সংগঠন। তার রয়েছে তীব্র আকর্ষণক্ষমতা—তা নিজের দিকে তিন শ্রেণির লোককে আকর্ষণ করেছে :

১. দাম্ভিক ও স্বার্থপর—ক্ষমতার প্রতি যাদের রয়েছে তীব্র অভিলাষ;
২. ভীরু—যাদের ভীরুতার কোনো সীমারেখা নেই।

৩. বদ ও ইতর—যাদের আত্মা নিকৃষ্ট।

তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির একচেটিয়া সুবিধাভোগ বাতিল করার জন্য একটি গণভোটের অনুষ্ঠান করেন। গণভোটের ফল দাঁড়ায় এই যে, কমিউনিস্ট পার্টির নয়-দশমাংশ কর্মী সুবিধাভোগ বাতিল করার পক্ষে তাদের সমর্থন জানায়। [দেখুন : তাহাফুতুল ফিকরিল মাদ্দি, ড. মুহাম্মদ আল-বাহি, ১৯৬৮ সালের ১৫ জুলাই তারিখের একটি জার্মান পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত।]

কমিউনিস্ট পার্টির অব্যাহত অত্যাচারের ফলে, আমরা দেখি যে, তাদের অনেক প্রতিভাবান লেখক যৌবনকালেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। যেমন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, ডাইসেন ও সিস্কি। তাঁরা তিনজনই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের আগেই আত্মহত্যা করেছিলেন। [দেখুন : আফয়ুনুশ শুয়ুব, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, পৃষ্ঠা ১৩৫]

উৎপাদনের ক্ষেত্রে কমিউনিজমের পতন

ক. কমিউনিস্ট পার্টির শাসনামলে বছরের পর বছর উৎপাদন কমতে থাকে। অবশেষে রাশিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো থেকে গম ক্রয় করার জন্য তাদের রিজার্ভ স্বর্ণ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। পশ্চিম বার্লিনের এক মার্ক (জার্মান মুদ্রা) কমিউনিস্ট শাসিত পূর্ববার্লিনের চার মার্কের সমপরিমাণ হয়েছিলো।

খ. শ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে নি এবং তাদের কপালে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যও জোটে নি, যার আশা মার্কস ও লেনিন তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বরং সোভিয়েত ইউনিয়নে (শ্রমিকদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে)-ও শ্রমিকেরা হতাশাগ্রস্ত যন্ত্রণাময় দুর্দশাজর্জরিত জীবনযাপন করেছে, পশ্চিমে কুকুরদের জীবনও ছিলো তাদের চেয়ে উন্নত।

গ. কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকদের উৎপাদন কমে যায়। রোমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ১৯৬৬ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর ঘোষণা দেন যে, রোমানিয়ার একজন শ্রমিকের উৎপাদন ইতালি বা ফ্রান্স বা জার্মানির একজন শ্রমিকের উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক।

ঘ. পরিমাণ ও গুণগত মান উভয় দিক থেকে উৎপাদনের মান কমতে থাকে। রোমানিয়ায় ১৩৭০ টি পণ্য লোকসান দেয়, লোকসানের পরিমাণ ছিলো ২৪০ মিলিয়ন বা ২৪ কোটি পাউন্ড। ১৯৬৭ সালে রোমানিয়ার

বাজেটে ঘাটতি ছিলো ২১৫ মিলিয়ন বা ২১ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড। [দেখুন : তাহাফুতুল ফিকরিল মাদ্দি, ড. মুহাম্মদ আল-বাহি, পৃষ্ঠা ৫০]

সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নির্মম বাস্তবতার শিলায় আঁদ্রে জিদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণবিচূর্ণ হয়। আঁদ্রে জিদ বলেন, 'একবেলা খাবারের সংস্থান করতে খরচ করতে হতো ২০০ থেকে ৩০০ রুবল; কিন্তু দৈনিক একজন শ্রমিকের মুজরি ৫ রুবলের বেশি ছিলো না।'

আঁদ্রে জিদ আরো বলেন, 'আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছি। ওখানে আমি গরিবদের দেখা পাই নি। কিন্তু আমি ওখানে এমন মানুষদের পেয়েছি যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরে বসবাস করে। ঘরের প্রতিটি ক্ষুদ্র কক্ষের আয়তন ৬ পা বাই ২ পা। এমন একটি কক্ষ চারজন মানুষের জন্য নির্ধারিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে যে-শ্রমিকেরা রয়েছে তাদের জানার সময় এসেছে যে, কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের পূর্বে তারা প্রতারণার শিকার হয়েছিলো যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকেরা ইতোপূর্বে প্রতারণার শিকার হয়েছে।' [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ২৩৬]

এখন সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন্ শ্রমিকটি কেবল সমাজতন্ত্রের নাম শোনাটা সহ্য করতে পারে? [আপনি যদি চান তাহলে Antoine Domaza-এর Return from Hell (عائد من الجحيم / নরক থেকে ফেরা) গ্রন্থটি পড়তে পারেন। এটি প্রকাশ করেছে 'দারুন নাফায়িস'।]

এখন পোল্যান্ডের কোন্ শ্রমিকটি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম শোনাটা সহ্য করতে পারে?!

শ্রমিকেরা তাদের দেশ ত্যাগ করেছে। চিন্তাবিদেরা দেশ ত্যাগ করেছেন। মেধাবীরাও দেশ ত্যাগ করেছেন। সব মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সময়ে সময়ে শ্রমিক ও ছাত্রদের শখ দাঁড়িয়েছে নিজেদের বাড়িতে আমেরিকান সিগারেটের খালি বাক্স জমা করা এবং পকেটে গুজে রাখার জন্য মার্কিন পতাকা সংগ্রহ করা।

তাদের হৃদয়ের গভীরে পশ্চিমা পণ্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। আপনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনে শ্রমিককে সহজেই অতি মূল্যবান উপহার দিতে পারবেন। যেমন : একটি আমেরিকান সিগারেট অথবা পশ্চিমাদের তৈরি একটি বলপয়েন্ট।

লাল লৌহ আচ্ছাদনের অভ্যন্তরেও বহু মানুষের আগ্রহ ও মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে জিনস (আমেরিকান ট্রাউজার)। ব্যক্তিমাত্রই জিনস কিনতে শুরু করেছে।

আমাকে একজন ছাত্র তাঁর সহপাঠীর ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি সত্যই বলেছেন। তাঁর সহপাঠীর কাছে একজন শিক্ষক এসে পাশ্চাত্যে তৈরি একজোড়া জুতার আশা ব্যক্ত করেন। এই জুতাজোড়া তাঁর সহপাঠী পুরো বছরই পায়ে দিয়েছেন। আর জুতাজোড়ার দাম দুই জর্ডানীয় ডলারের চেয়েও কম।

আমাকে আর-এক ছাত্র তাঁর শিক্ষিকার (প্রফেসর) ঘটনা বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সে যদি জর্ডান থেকে তাঁর জন্য একটি আমেরিকান জিনসের ট্রাউজার এনে দিতে পারে তবে তিনি বিনিময়ে ছাত্রকে তাঁর কন্যাদান করবেন।

বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে শ্রমিকদের অবস্থা এই :

১. তারা তাদের রুটিনমাফিক কাজে আবদ্ধ;

২. দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল;

৩. কোনো কারণ ছাড়াই তারা বেঁচে আছে এবং কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তারা চলছে।

কমিউনিজমের অন্ধকারে যারা বসবাস করছে তাদের সবার আত্মা হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। উদ্বেগ ও অস্থিরতা তাদের জন্য স্বাভাবিক ও সাধারণ হয়ে পড়েছে।

তবে কার্ল মার্কস যেভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন ও সতর্কতা জারি করেছিলেন, শিল্পোন্নত পশ্চিমা বিশ্বে শ্রমিকদের দুর্দশা ও যন্ত্রণা সেভাবে বৃদ্ধি পায় নি। বরং মার্কস যার আশঙ্কা করেছিলেন তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছে : শিল্পোন্নত পশ্চিমা বিশ্বে শ্রমিকদের মুজরি ও অবস্থান দুটোই উন্নত হয়েছে। তারা সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা লাভ করেছে এবং চরম দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের সময় আর্থিক সুরক্ষাও লাভ করেছে।

দিনে দিনে শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও অদক্ষতা দূর হয়েছে; তারা শিক্ষিত, প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ও কর্মকৌশলী হয়ে উঠেছেন।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে শ্রমিকদের জীবনে দুরবস্থাই বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্দশা তাদেরকে গ্রাস করেছে।

মানবিকতা, অনুভূতি, চিন্তা ও শিল্পচেতনার দিক থেকে কমিউনিজমের পতন

মার্কসবাদ মানুষকে একটি যন্ত্র বা হাতিয়ার সাব্যস্ত করেছে এবং সেভাবেই আচরণ করেছে। মার্কসবাদ মানুষের সঙ্গে অনুভূতিহীন জন্তু ও চিন্তাহীন প্রাণীর মতো আচরণ করেছে। ফয়েরবাখ মনে করেন, প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও মনীষা তাঁরাই যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেন, সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অর্থনীতি নির্মাণ করেন।

আর কার্ল মার্কস মনে করেন, একমাত্র অর্থনীতিই প্রতিভাবান ও মনীষা সৃষ্টি করে।

কার্ল মার্কস মনে করেন, মানবসমাজ কয়েকটি খোঁয়াড়ের মতো, খাদ্য ও পানীয়ের পরিমাণ এবং নৈরাজ্যের মাত্রাই মানবখোঁয়াড়গুলোকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নিয়ে যায়।

বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর সাহিত্য, শিল্প, চেতনা, গল্প-উপন্যাস-নাটক সবকিছু যন্ত্রের চাকার সঙ্গে ঘুরতে থাকে। কথাও একটি পণ্য ও কপটতার অর্থ পরিগ্রহ করে। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করে কোনো কথা বলা হলেই ওই কথাকে তার বক্তাসহ মাটির নিচে অথবা শাস্তির চাবুকের নিচে পুঁতে ফেলা হতো।

র‍্যামন্ড অ্যারন—কলেজ ডি ফ্রান্সের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক—বলেন, 'যে-বিপ্লবের রূপকথার দিকে মার্কবাদীরা ছুটে গিয়েছিলো যে তা মানবতাকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তির হাতিয়ার, তা ভয়াবহ প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। এই বিপ্লব মানবসমাজের সভ্যতার ভিতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য এবং পবিত্র রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়ার জন্য কেবল যুদ্ধ ও নৈরাজ্যের আগুনই প্রজ্বলিত রেখেছে। এই বিপ্লবের পরে একনায়কতন্ত্রের ভয়ঙ্কর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তা লোহা ও আগুনের শক্তিবলে তার ক্ষমতাকে জাতিসমষ্টির ওপর আবশ্যক করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদী একনায়কতন্ত্রের দুঃশাসন স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছে, চিন্তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে, উন্নত জীবন ও উত্তম ভবিষ্যতের নৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে বিনষ্ট করেছে।' [দেখুন : The Opium of the Intellectuals, Raymond Aaron (১৯৫৫), পৃষ্ঠা ১৬]

আঁদ্রে জিদ বলেন, যে-সংস্কৃতি বা যে-শিল্প-সাহিত্য কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে একমত হতে পারে নি, সেগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, মাটির নিচে দাফন করে দেয়া হয়েছে, ঠাট্টা-তামাশা করা হয়েছে, ফলে সেসব সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য আলোর মুখ দেখে নি। [দেখুন : আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পৃষ্ঠা ২৩৬]

এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শের বিরোধী সব প্রতিভা, শক্তি ও চিন্তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়।

এ-কারণে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী মত পোষণকারী অধিকাংশ চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক তিনটি পথ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। তাঁরা এই তিনটি পথের কোনো একটিকে বেছে নেন।

১. পশ্চিমা দেশগুলোতে পালিয়ে যাওয়া—সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই প্রবণতাই সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেসব প্রতিভাবান ব্যক্তি বাস করতেন তারা পালিয়ে গেছেন।

২. আত্মহত্যা, মানসিক বিকৃতি ও বিদ্রোহের মাধ্যমে জীবন থেকে মুক্তিলাভ।

৩. যারা কমিউনিস্ট পার্টির নামে স্তব গাইতো, প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো এবং লোবান জ্বালিয়ে রাখতো সেইসব চাটুকারদের দলে জায়গা করে নেয়া। তাদের কাছে জীবন ও জীবনের মূল্যবোধ এক মুঠো খাবার ও এক টুকরো কাপড়ের মূল্যের সমান হয়ে যাওয়ার ফলে তারা তাদের সমস্ত চিন্তাকে সমাধিস্থ্ করে দেয় ।

আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য ও চিন্তার ঐক্যের দিক থেকে সমাজতন্ত্রের পতন

সমাজতন্ত্র তার চিন্তা এবং অনুশীলনে বাস্তবতায় ভয়ঙ্কারভাবে বিপর্যয়ের শিকার হয়। কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলো কার্লমার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারাকে পরিত্যাগ করতে আহ্বান জানায়। কারণ, যেসব দেশ কার্লমার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারাকে আঁকড়ে ধরেছে তারা স্থবিরতায় আক্রান্ত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে প্রদত্ত ক্রুশেভের ভাষণগুলো স্ট্যালিনের অপকর্ম ও অপরাধগুলোকে উন্মোচিত করে এবং যাঁরা কমিউনিজমের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ছিলেন তাঁদের অনেকের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার

শিকার হয়। ক্রুশ্চেভ তাঁর পূর্বসূরি স্ট্যালিন সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, স্ট্যালিন ছিলেন জংলি, অপরাধপরায়ণ ও নোংরা। ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের দেহাবশেষ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমাধিস্থল থেকে তুলে নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত গোরস্থানে সমাহিত করেন। এ-ধরনের চলমান আরও অনেক উদাহরণ আছে : ১৯৫৬ সালের পর ফ্রান্সে রোগার গারাউডি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেন এবং তিনি প্রাচীন চিন্তাধারার বিকাশ ও অগ্রগতির আবশ্যকতার বিষয়টি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন। বি. লেভি কমিউনিজম সম্পর্কে একটি বই লেখেন; তাঁর বইয়ের শিরোনাম : 'মনুষ্যত্বের মুখোশপরা পরা বর্বরতা'। জি. পিনো কমিউনিজম সম্পর্কে একটি বই লেখেন; তাঁর বইয়ের নাম : 'কার্লমার্কসের মৃত্যু'। [আল-মা'রিফাহ, তিউনিসিয়া, সংখ্যা-৩, ৫ম বর্ষ, মার্চ, ১৯৭৯]

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক চীন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একজোট হয়। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতা মাও সেতুং তাঁর নিজের জন্য যে-বৃহৎ বলয় নির্মাণ করেছিলেন তার পতন ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর দুটি বছরও অতিক্রান্ত হতে পারে নি, তার আগেই তাঁর সৃষ্ট বলয়ের পতন ঘটে।

চীনের পত্রিকাগুলো তাদের বড় নেতা মাও সেতুং সম্পর্কে বলে, 'মাও ছিলেন একনায়ক, চিন্তাধারায় ফ্যাসিবাদী; তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিচার এবং যারা বিপ্লবের বলি হয়েছিলো তাদের পুনর্বাসনের দাবি জানায়। তারা লাল আর্মির (রেড গার্ড)-এর প্রবীণ নেতাদের মৃত্যুদণ্ডও দাবি করে।' [প্রাগুক্ত]

র‍্যামন অ্যারন্ড মাও সেতুং সম্পর্কে বলেন, এই উন্মত্ত বামপন্থী ছিলেন বিশৃঙ্খলাপ্রিয় ও কলহমাতাল, মনোবৈকল্য-আক্রান্ত ও গূঢ়ৈষাগ্রস্ত। ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। তাঁর অবস্থা ছিলো কিছু ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার অবস্থার মতো, যেগুলোর উত্তরাধিকার ছিলেন তিনি, ওগুলোর সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাঁর ঐক্য ছিলো রূপকথার ঐক্য, তার বেশি কিছু নয়। তিনি মোটেই একব্যবদ্ধ হন নি; বরং সবসময় বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন। [দেখুন : The Opium of the Intellectuals, Raymond Aron, পৃষ্ঠা ৮]

কার্ল মার্কস ও লেনিনের চিন্তাধারা এমন কোনো চিন্তাধারা হিসেবে বিবেচিত হয় নি যা পশ্চিমাকে পূর্ণতা দিতে পেরেছে এবং তার শূন্যতাকে ভরিয়ে

দিতে পেরেছে। কমিউনিস্টদের কাছে মার্কসবাদ অর্থনৈতিক কুমন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। বহু সংখ্যক কমিউনিস্ট গির্জায় যাওয়া-আসা করছে এবং তারা কার্ল মার্কস এবং লেনিনের বক্তব্যকে পদদলিত করছে, যে-লেনিন বলেছিলেন, কোনো স্রষ্টা ও উপাস্য নেই এবং জীবন হলো বস্তু। কিছু জরিপ ও পরিসংখ্যান বেরিয়েছে, যা বলছে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি শতকরা সত্তর ভাগ সদস্যই গির্জার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এখনো, এই ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের অনুশীলন তার আসল আঁতুড়ঘরেই থেকে গেছে। তা এ-কারণে নয় যে, তা অনুশীলিত হয়েছে (তারপরও বিকশিত হয় নি); বরং এ-কারণে যে, রাষ্ট্রগুলো বাস্ত বায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের বিপরীত কাজ করেছে। কেননা, মানুষের পৃথিবীতে এই চিন্তাধারা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়।

সাম্যবাদ বা মার্কসবাদ সমাজে শ্রেণিবিভাজন দূর করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বরং সমাজতান্ত্রিক সমাজ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে : কমিউনিস্ট পার্টি ও তার ক্যাডারদের শ্রেণি, তারা ছিলো বিলাসপরায়ণ ও বৈভবশালী; আর দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিলো বাকি সব মানুষ, তারা ছিলো বিচ্ছিন্ন অংশ, যাদের ঘাম ও রক্ত চুষে নেয়া হয়েছে এবং তারপর টেনেহিঁচড়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো হয়েছে অথবা নির্বাসিত করা হয়েছে। [রুশ দার্শনিক সলগেস্তভ এ-বিষয়ে একটি বই লিখেছেন, তিনি বইটির নাম দিয়েছেন, '১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কি সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্ষুণ্ন ছিলো?'।

পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া শ্রেণির পরিবর্তে কমিউনিস্ট পার্টি আপতিত হয়েছে এবং জোঁকের মতো জাতির রক্ত চুষে নিয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি মূর্খ ও নির্বোধদের জন্য আবির্ভূত হয়েছে আফিমরূপে, ফলে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের ঘাড়ের ওপর থেকেছে খোলা তরবারিরূপে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করেছে।

মার্কবাদ মানুষের হৃদয় থেকে তাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা মুছে দিতে ব্যর্থ হয়ে হতাশাবোধ করেছে, যেমন তারা শুরুতে দাবি করেছিলো। অবশেষে তারা চাপে পড়ে ও স্বভাবের পীড়াপীড়িতে পরিবারের অনুমতি দেয়। আপনি যদি দেখতেন, যদি জার—যাকে মানুষ ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সময় মেরে ফেলেছে—তার কবর থেকে উঠে আসতো, তাহলে তাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের কেমন হতো! তারা অবশ্যই বলতো, আমাদের জন্য পূর্ণিমার চাঁদ

উদিত হয়েছে এবং তারা তাকে অবশ্যই উপাস্য প্রতিমারূপে গ্রহণ করতো!!

কমিউনিস্টরা গণতন্ত্র ও সাম্যের বীণায় সুর তোলে, যেনো তার সুরের চারপাশে নিপীড়িত মানুষেরা একত্র হয়, যারা বিপ্লবকে তাদের কাঁধে বহন করে নিয়ে এসেছে। তারপর তাদের অবস্থা হয় পশুপালের চেয়েও খারাপ—চাই তাদের বস্তুগত জীবনে, চাই তাদের আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে, চাই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বেলায়।

মানবিক স্বভাব ও প্রকৃতি কখনো মানুষের তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে পরাজিত হয় না। কারণ, এসব প্রতিষ্ঠান মানবিক স্বভাবের ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়, স্বভাবের সঙ্গে এগুলোর কোনো দৃঢ়মূল বন্ধন নেই। মানুষের তৈরি নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। কারণ, আত্মার শূন্যতা কেবল তার স্রষ্টার পথ ও পদ্ধতিই পূরণ করতে পারে। আর কিছুই তা পারে না। পশ্চিমা বিশ্ব তার উভয় শাখাসহ মানুষের সৌভাগ্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তারা মানুষকে চেনে না, বোঝে না। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যা-কিছুর বিশ্লেষণ করতে পেরেছে বা যা তারা তাদের অনুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখতে পেরেছে, কেবল তা-ই তারা প্রবর্তন করতে পেরেছে। এ-কারণে প্রযুক্তি ও বস্তুগত জগতে তারা মনখুশিমতো উদ্ভাবন করেছে।

কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব মানুষকে মানুষ বিবেচনা করে তাদের সামনে কোনোকিছু উপস্থাপন করতে পারে নি। তারা মানুষের আত্মাকে সুখ দিতে পারে নি; মানুষের গ্লানি ও দুর্দশা দূর করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তা হয়েছে কেবল একটি মাত্র কারণে : ইউরোপ কখনো আত্মাকে চেনে নি; কারণ, আত্মা মিটারে মাপা যায় না, বাটখারায় ওজন করা যায় না, ভোল্টিমিটারে পরিমাপ করা যায় না, ব্যারোমিটারেও আত্মার চাপ ধরা যায় না।

অতএব, ইউরোপীয়রা মানুষের জন্য তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে যে-চিকিৎসাই পরিবেশন করেছেন তা-ই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, তারা অজ্ঞাত এক ব্যাধির চিকিৎসা প্রদান করেছে।

মানুষকে সুখ ও সৌভাগ্যমণ্ডিত করার যে-প্রণালি প্রদান করা হয়েছে, তা হলো এই মানুষ সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের প্রদত্ত প্রণালি। তারা আত্মাকে সুখী করতে চেয়েছে; কিন্তু আত্মা কী তা তারা জানে না। তারা আত্মার সঙ্গে

কথা বলছে এমন ভাষায়, যে-ভাষা আত্মার বোধগম্য হয়। তারা আত্মার সঙ্গে কথোপকথন করছে এমন শব্দমালায়, আত্মা যার অর্থ অনুধাবন করতে পারছে না। তারা আত্মাকে তার যন্ত্রণা ও গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য পরিবেশন করেছে ঐশ্বর্য, যৌনতা, আড়ম্বর ও বিলাস; কিন্তু আত্মার তৃষ্ণাই কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, এসবকিছু আত্মার খাদ্য নয়। তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো, যে ক্ষুধার্ত পাকস্থলীর জন্য পরিবেশন করেছে বিপুল অর্থ, গালভরা স্লোগান এবং গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে মেডেল। এসবকিছু ক্ষুধার্ত পাকস্থলীর জন্য পরিবেশিত ছোট এক টুকরো রুটির কাজও করতে পারবে না। কারণ, পাকস্থলীর ক্ষুধা দূর করার জন্য এটাই মহান প্রতিপালকের প্রণালি ও পদ্ধতি।

এমনিভাবে আত্মার খাদ্য হলো তার রবের ইবাদত, তার স্রষ্টার আনুগত্য, তার ইলাহের আজ্ঞানুবর্তিতা। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন : فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ 'যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না।' [সুরা তোয়া-হা : আয়াত ১২৩]

ব্যক্তিপরিচিতি

কিয়েৰ্কেগার্ড

ডেনমার্কের অধিবাসী সোরেন আবে কিয়ের্কেগার্ড (Søren Aabye Kierkegaard) প্রথম অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে ব্যাপক পরিচিত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজ-সমালোচক ও ধর্মীয় লেখক। জ্ঞানের প্রশ্নে তিনি হেগেলের 'চরম জ্ঞান'-এর তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। মানুষের পক্ষে চরম জ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং চরম জ্ঞান হলো যুক্তিযুক্ত জ্ঞান—হেগেলের এ-তত্ত্বকে কিয়ের্কেগার্ড আগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন, ব্যক্তির জন্য জ্ঞান অবশ্যই একটি বহিরাগত বিষয়। ব্যক্তির জ্ঞান আহরণ করতে হয় তার শিক্ষক ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর যে কেবল আমাদের জ্ঞান দান করেন তা-ই নয়, তিনি সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আমাদের দান করেন। কিয়ের্কেগার্ড যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন তা তার জ্ঞানতত্ত্বেই প্রকাশিত।

হলবাখ

পুরো নাম পল-হেনরি থিরি ব্যারন ডি হলবাখ (Paul-Henri Thiry, Baron d' Holbach)। ফরাসি-জার্মান লেখক, দার্শনিক, বিশ্বকোষপ্রণেতা। The System of Nature (১৭৭০) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এটিকে বস্তুবাদের বাইবেল বলে অভিহিত করা হয়।

স্পিনোজা

বারুখ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) ওলন্দাজ বস্তুবাদী দার্শনিক। হল্যান্ডে তাঁর জন্ম। স্পিনোজার মুক্ত চিন্তার জন্য আমস্টারডামের ইহুদি সম্প্রদায় তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিলো। তিনি মনে করতেন প্রকৃতি একক এবং তার নিজস্ব কারণে সৃষ্ট। প্রকৃতি সনাতন এবং অসীম। তিনি জ্ঞানের ইন্দ্রিয়জ প্রকৃতিকে স্বীকার করতেন। সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদে তিনি ছিলেন টমাস হবসের অনুসারী।

সিসমন্দি

জাঁ শার্ল লেওনার সিমোঁদ দ্য সিসমন্দি সুইস অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবেত্তা, পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা।

নোয়েল বেব্যেফ

ফরাসি বিপ্লবী ফ্রাঁসোয়া নোয়েল বেব্যেফ ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি একটি গুপ্ত সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন; এই সঙ্ঘ একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছিলো। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং ১৭৯৭ সালের ২৭ শে মে বেব্যেফের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়।

লেনিন

রুশদেশে ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নেতা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭০ সালে সিম্‌বির্স্ক্ অঞ্চলে তাঁর জন্ম। আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্। লেনিন (Lenin) তাঁর ছদ্মনাম।

কিশোর বয়স থেকেই লেনিন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেন। রুশ সম্রাট বা জারকে হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো তার বড়ো ভাইয়ের। এই ঘটনাই তাঁকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৯১ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০০ সালে দেশের বাইরে থাকার সময় তিনি 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৩ সালে তৎকালীন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে জার বিরোধী অভ্যুত্থানে জারের পতন না ঘটলেও ১৯১৭ সালের অভ্যুত্থানে জারের পতন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ৯ই নভেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারপ্রধান ছিলেন।

কার্ল মার্কস এবং ফ্রেড্‌রিখ এঙ্গেল্‌স্-এর চিন্তার সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যার জন্যে তিনি বিখ্যাত। তাঁর এই চিন্তাই লেনিনবাদ নামে পরিচিত। ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও গণিতবিদ। তিনি ১৮৭২ সালে ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক যুগের যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। প্রাঞ্জলতা, বুদ্ধিমত্তা, আবেগময়তা ও সাহিত্যগুণে তাঁর ভাষা অনন্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' (Principia Mathematica, তিন খণ্ড, আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট্‌হেড-এর সঙ্গে

যৌথভাবে); 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা' (Introduction to Mathematical Philosophy); 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' (History of Western Philosophy); 'সুখ' (In Quest of Happines, বাংলা অনুবাদ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী); 'জার্মান সামাজিক গণতন্ত্র' (German Social Democracy); 'বিবাহ ও নৈতিকতা' (Marriage and Morals, অনুবাদ : আরশাদ ইকবাল); 'রাজনৈতিক আদর্শ' (Political Ideas, বাংলা অনুবাদ : আবুল কাশেম ফজলুল হক); 'সংশয়ী রচনা' (Sceptical Essays, বাংলা অনুবাদ : আহমদ ছফা); 'অপ্রিয় রচনা' (Unpopular Essays, অনুবাদ : সুহৃদ সরকার); 'সমাজে বিজ্ঞানের প্রভাব' (Impact of Science on Society, অনুবাদ : সুহৃদ সরকার); 'আমি কেনো খ্রিস্টান নই' (Why I am not a Christian?)।
তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী শান্তি-আন্দোলনের নেতা। ১৯৬১ সালে যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের বিরুদ্ধে তিনি বিশ্বব্যাপী প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন।
দর্শনের ক্ষেত্রে রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো নতুন। দর্শনকে তিনি কোনো কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক সমাধানের আকর মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করাই দর্শনের কাজ। মানুষের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তাকে ভাব প্রকাশের সঠিক বাহনে পরিণত করার চেষ্টা করাও দর্শনেরই কাজ। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কর্মক্ষম ও সচল ছিলেন।

আঁদ্রে জিদ

আঁদ্রে জিদের পুরো নাম আঁদ্রে পল গিওম জিদ (André Paul Guillaume Gide)। তিনি ১৮৬৯ সালের ২২ শে নভেম্বর প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা গেলে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁকে মানুষ হতে হয়। প্রবন্ধকার হিসেবেই জিদ তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা করেন। পরে লেখেন কবিতা, জীবনী, গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা ও সমালোচনা; অনুবাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৭ সালে আঁদ্রে জিদ ফরাসি তরুণদের কাছে একজন মহাপুরুষের মতো নমস্য হয়ে ওঠেন। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি সীমাহীন বিতর্ক ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। অনেকের মতে, জিদের চার খণ্ড বিশিষ্ট আত্মজীবনীমূলক রচনা জার্নালস (Journals, 1889–1949) তাঁর সর্বোত্তম সাহিত্যকীর্তি।

নবম পরিচ্ছেদ

ইসলামি বিশ্বে কমিউনিজম ছড়িয়ে পড়ার কারণসমূহ

এখানে অনেক কারণ আছে যা আরব ও ইসলামি বিশ্বে কমিউনিজম ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্ণনা করা হলো।

মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমাদের উপনিবেশ স্থাপন

মুসলমানেরা পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যন্ত্রণা ভোগ করেছে। বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিলো। ব্রিটেন পূর্ব প্রাচ্যে/আরবে[৬৬] উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো আর ফ্রান্স উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো সিরিয়া ও পশ্চিম প্রাচ্যে/আরবে[৬৭]। তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় আমেরিকা এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য উপনিবেশ বজায় রাখে। এভাবে পশ্চিমারা মুসলমানদের রক্ত চুষে নেয়, তাদের ভূমি ছিনিয়ে নেয়, তাদের পবিত্র বস্তুসমূহকে পদদলিত করে এবং তাদের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত করে। যা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যারা এই দীনের (ইসলামের) প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতো তাদের সবার হৃদয়ে বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করে। কিন্তু মুসলিম যুবকেরা তখনো লাল শাসনের (কমিউনিজমের) বিপদ ও দুর্দশার অভিজ্ঞতা লাভ করে নি। ফলে তারা কমিউনিজমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই ধারণায় যে, তা তাদেরকে পশ্চিমের হন্তারক অক্টোপাসের কবল থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু যুবকেরা দুর্বল জাতিগুলোকে মুক্তি দেয়ার যে-গান নিয়ে মস্কো গর্বে বুক ফুলিয়ে রাখতো তাতে প্রতারিত হয়।

---

[৬৬] যেসব মুসলিম দেশ ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিলো সেগুলো হলো : আফগানিস্তান, বাহরাইন, ব্রুনেই, ভারত, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়ামেন, মিশর, গাম্বিয়া, নাইজেরিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, সিয়েরা লিওন।

[৬৭] যেসব মুসলিম দে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন ছিলো সেগুলো হলো : লেবানন, সিরিয়া, আলজেরিয়া, বারকিনা ফাসো, শাদ, কমোরোস, জিবুতি, মালি, মৌরিতানিয়া, নাইজার, সেনেগাল, গিনি।

ইসলামি বিশ্বে পশ্চিমাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপকরণ

নির্লজ্জ যৌনতা, নগ্নতা ও অবাধ মেলামেশার প্রচার-প্রসারে মিডিয়াকে কেন্দ্রীভূত ও সংহত করা যৌন নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে এবং যুবক শ্রেণিকে কামোন্মত্ততার নোংরা দুর্গন্ধময় জলাশয়ে নিমজ্জিত করেছে। আর কমিউনিজম এমন পরিবেশ ছাড়া তার অঙ্কুর উদ্‌গত করতে পারে না। একইভাবে ইসলামের আলেম-উলামার দুর্নাম রটানো, তাঁদের সম্মানহানি করা এবং তাঁদের শক্তিহীন করে দেয়ার জন্য মিডিয়াকে সংহত ও সুদৃঢ় করা হয়েছে। যুবক শ্রেণি ও জাতির সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং যাঁরা তাদের জন্য এই দীনের দাওয়াত দেবেন ও ইসলামের উপঢৌকন তুলে দেবেন তাঁদের মধ্যে কঠিন অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে যুবক শ্রেণি হন্তারক ও সর্বনেশে চিন্তাধারা ও মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এই ধারণায় যে, তা তাদের আত্মিক শূন্যতাকে ভরিয়ে দেবে।

এগুলোর সঙ্গে যোগ করুন : এক বিষাক্ত খঞ্জর—তা হলো পাঠ্যব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম—মুসলিম জাতিকে মহান রাব্বাল আলামিনের নাযিলকৃত নুর ও আলোর শিক্ষা থেকে আড়ালে নিয়ে গেছে। (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে) আল্লাহর দীন শেখার জন্য যে-সময় নির্ধারিত হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি সময় নির্ধারিত হয়েছে কেবল ভিনদেশি ভাষা শেখার জন্য। ডানলপ ও ক্রোমার এভাবেই পরিকল্পনা করেছিলেন।

এ-বিষয়ে কিছু উদাহরণ

আফগানিস্তানে

বাদশাহ জহির শাহ নারীদের স্বাধীনতার অনুমতি দিয়ে নিজ হাতে নারীর হিজাব (মাথার পর্দা) টেনে খোলেন এবং পায়ের নিচে মাড়ান। ফলে যুবকেরা তাদের যৌন উন্মত্ততা মেটানোর জন্য ছুটে যায়। এটাই কমিউনিজমকে যৌবনপ্রাপ্ত করেছিলো এবং কিছুকাল পরে কমিউনিজমই স্বয়ং বাদশাহ জহির শাহ'র মূলোৎপাটন করেছিলো।

মুসলিম ইন্দোনেশিয়ায়

পাশ্চাত্য উপায়-উপকরণই (ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট) আহমদ সুকর্নকে ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রদান করেছিলো। ফলে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কমিউনিজমের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয় এবং তার সদস্য সংখ্যা

দাঁড়ায় দুই মিলিয়নে। পৃথিবীতে চীন ও রাশিয়ার পরে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিই ছিলো সবচেয়ে বড়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিজ ব্যর্থ হওয়ার পর শূন্যতা পূরণ করার জন্য খ্রিস্টবাদ এগিয়ে আসে। [পাশ্চত্য ঘোষণা দিয়েছে যে, ২০০০ সালের মধ্যে গোটা ইন্দোনেশিয়া খ্রিস্টানে পরিণত হবে।]

সুদানে

সুদানে ইসলামি আন্দোলন ব্যর্থ হয়, ফলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। যুবক শ্রেণি কমিউনিজমের শরণাপন্ন হয়। আর কমিউনিজম ব্যর্থ হওয়ার পর খ্রিস্টবাদ এগিয়ে আসে।

মিসরে

প্রায় পৌনে এক শতাব্দীব্যাপী অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়ন ও গণহত্যার ফলে মিসরে ইসলামি আন্দোলন সফলতা আয় করতে পারে নি। ফলে কমিউনিজম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন কমিউনিজমের তৎপরতা কমে যায় তখন শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে কপটিক (মিসরে প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম) খ্রিস্টবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

ইহুদিদের প্রতি উদারতা ও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব

ইহুদিরাই কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তার দর্শনের মূল হোতা। ইতোপূর্বে আমরা এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ-কারণে তারা ইসলামি বিশ্বে বিশেষ করে আরব বিশ্বে সমস্ত কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই এলাকায় ফিলিস্তিন ছিলো ইহুদি কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার সরবরাহকেন্দ্র। রাশিয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী রপ্তানির ক্ষেত্রে ফিলিস্তিন ছিলো একটা মূল পয়েন্ট।

কমিউনিস্টরা সবসময় ইসলামি বিশ্বকে ইসরাইলের সঙ্গে জুড়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে। মুহাম্মদ সাইয়িদ আহমদ নামের একজন মিসরীয় কমিউনিস্ট লেখক আনোয়ার সাদাতের ইসরাইল সফরের পূর্বে ১৯৭৫ সালে একটি বই লেখেন। তিনি বইটির নাম দেন بعد أن تسكت المدافع 'কামান থেমে যাবার পর'।

এই লেখক শান্তি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, শান্তি দুই প্রকার : প্রথম প্রকার হলো আত্মরক্ষামূলক শান্তি, তা নিশ্চিত হয় সীমান্ত

রেখা, যুদ্ধবিরোধী মানুষ ও প্রহরার মাধ্যমে। দ্বিতীয় প্রকার হলো প্রগতিশীল শান্তি, তা নিশ্চিত হবে মিসর ও ইহুদিদের যৌথ অর্থায়নে (পেট্রোকেমিকেলের) বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। একইভাবে বড় বড় খামারে ইহুদি ও আরবদের অর্থ যৌথভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ থেকে যাবে। কারণ, তখন ইহুদি ও আরব উভয় পক্ষের লোকেরা তাদের ধন-সম্পদ, কলকারখানা ও খামারের ব্যাপারে সতর্ক ও শঙ্কিত থাকবে।

সাইয়িদ আহমদের বইটি লেবাননে মুদ্রিত হয়। কায়রো বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য তা আটকে দেন। কিন্তু একদিন পরেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বইটি ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দেন। এই কমিউনিস্ট লেখকের বক্তব্যগুলো ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব প্রমাণিত হয়। [তাহরিরুল মুজতামা-এর সাবেক পরিচালক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব শায়খ যয়নুল আবেদিন আর-রিকাবি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ থেকে আমি এই পরিচ্ছেদের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি।]

সামাজিক অনাচার এবং জীবনযাপনের মানদণ্ডে বড় ধরনের বৈষম্য

সমাজের মুষ্টিমেয় অংশ যে বিপুল ঐশ্বর্য ও বিলাসে নিমজ্জিত, তা দরিদ্রতার শিকার ও ক্ষুধার থাবায় ছিন্নভিন্ন বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রোধ ও ঘৃণার সৃষ্টি করেছে। তারা বিশ্বাস করেছে যে, কমিউনিজম সমাজে ইনসাফ, ন্যায়বিচার ও সাম্য ছড়িয়ে দেবে। কম করে হলেও তা বিলাসমত্ত বুর্জোয়া শ্রেণিকে গুঁড়িয়ে দেবে। বিলাসমত্ততার একটি উদাহরণ আমি দিই : পেট্রোলের মালিক একটি রাষ্ট্রের আমির তাঁর কন্যাকে বিয়ে দেন। এই বিবাহোৎসবের পোশাকের মূল্য ছিলো এক লাখ দিনার। 'ওরদাতুল জাযায়িরিয়্যাহ'কে গান গাওয়ার জন্য দেয়া হয়েছে ষাট হাজার দিনার। দুই রাতের অনুষ্ঠানের ব্যয় ছিলো পাঁচ লাখ দিনার। ধনিক শ্রেণি যে অনর্থক তাদের সম্পদ ভাসিয়ে দিচ্ছে এবং নির্বোধের মতো অর্থ অপচয় করছে সেদিকে ক্ষুধার্তদের দৃষ্টি খুলে দেয়ার জন্য একটি কমিউনিস্ট প্রচারপত্র প্রকাশ ও প্রচারের পেছনে এই ঘটনা ছিলো শক্তিশালী কারণ।

এমনিভাবে আমরা দেখি যে, কমিউনিজম জর্ডানে শরণার্থীদের তাঁবুতে উর্বর চারণভূমি পেয়েছে, সেখানেও আছে ওই একই বিষয়—অনাটন ও অনাহার। ইরানে শাহের ঔদ্ধত্য ও বিলাসিতা এবং তাঁর অনুচরবর্গের

অহঙ্কার ও আড়ম্বরের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি তার অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশের অনুকূল পরিবেশ পেয়ে যায়। বিলাসগর্বিণী বেগম ও শাহজাদিরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিমানযোগে কেবল চুলের পরিচর্যার জন্য প্যারিসে যেতেন এবং ফিরে আসতেন।

যেসব লালাভ রজনীতে প্যারিস ও লাস ভেগাসে পানীয়ের সবুজ টেবিলে মদের ফোয়ারা ছুটতো, সেগুলোই কমিউনিজমের ভাষণ-বক্তৃতা এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের প্রচার-প্রসারের জন্য উর্বর উৎস হয়ে থাকে। এই তথ্য আপনার জন্য যথেষ্ট যে, ১৯৭৯ সালের মে মাসে জেদ্দায় দুটি বিড়ালের বিয়েতে এক বিলাসমাতালের পক্ষ থেকে এক লাখ রিয়াল খরচ করা হয়। [আল-কাবস, কুয়েত, ২৪.০৭.১৯৭৯]

ইসলামের নামে নষ্ট আকিদা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কল্পকাহিনির প্রসার

কবরে শায়িত অলি-আওলিয়াদের সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহিনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে : তাঁরা ব্যাধিগ্রস্তদের আরোগ্য দান করেন, তাঁদের সন্তান ও প্রিয়জনদের যারা কষ্ট দেয় তাদের ক্ষেত্রে তাঁদের কারামত প্রকাশ পায়। এসব কল্পকাহিনি থেকে সুবিধা গ্রহণ করে সাম্যবাদীরা ধর্মকে লক্ষ করে তাদের তীর নিক্ষেপ করে, তারা ঘোষণা করে যে, ধর্ম জাতির জন্য আফিমস্বরূপ এবং ধর্ম রূপকথা ছাড়া কিছু নয়।

এ-কারণে ইতালিতে আমরা যা দেখেছি তা আশ্চর্যজনক কিছু নয় যে, ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণভাবে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি। তারা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক খ্রিস্টান পার্টির মোকাবিলা করে। নির্বাচনে খ্রিস্টানজগতের পোপ খ্রিস্টান পার্টির সমর্থন করেন এবং পশ্চিমা বিশ্ব প্রকাশ্যে ও গোপনে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে চায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি যাতে বিজয়ী না হয়। তারপরও কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় সমান সমান আসন পায়। এভাবে কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টের আসনসংখ্যায় ও মন্ত্রিসভায় তাদের প্রভাব বজায় রাখে। যদিও আমেরিকা ঘোষণা করেছে যে, তারা এই নির্বাচনের অনুমোদন করে না।

ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি মূলত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি ইতালীয় যুবকশ্রেণির ঘৃণা ও অবজ্ঞার আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। খ্রিস্টধর্মের জটিলতা, বিদ্বেষপরায়ণতা, ক্ষমার বিষয়, পবিত্র নৈশভোজ (Holy Supper), ক্রুশ, ত্রিসত্তা (পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা) যুবকশ্রেণির মধ্যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা সৃষ্টি করেছে।

মুসলিম আলেম-উলামার বিশ্বাসঘাতকতা

শয়তান ও ইতরেরা যেসব জুলুম ও অনাচারে লিপ্ত থেকেছে, তার সামনে আলেম-উলামার নিশ্চুপ ও বোবা হয়ে থাকা; বরং যে-গোষ্ঠী এই দীনের মাধ্যমে উপকারিতা লাভ করে তাদের নীরব থাকা, শাসকদের কর্মকাণ্ডকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ ঘোষণা করা, মানুষদের জন্য তাদের কার্যকলাপকে সজ্জিত করে তোলা, কতিপয় বিধির মাধ্যমে জনমণ্ডলীর চিন্তা-চেতনাকে ধোঁকায় ফেলা মধ্যযুগে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ যে-ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কথা মনে করিয়ে দেয়—তাঁরা শাসকদের সঙ্গে রক্তে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য মানুষের রক্ত চুষে নিয়েছিলেন। রুশ কার্ডিনাল রাসপুটিনের নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের ফলে কমিউনিজম কতই না লাভবান হয়েছে। যেসকল সম্ভ্রান্ত নারী রাসপুটিনের হাতে পাপক্ষালনের জন্য আসতেন, রাসপুটিন তাদের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হতেন।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় আল-আযহারের যে-সকল আলেম আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করেছিলেন (তুচ্ছ মূল্যে আল্লাহর আয়াত বিক্রি করেছিলেন) তাঁদের সিদ্ধান্ত শান্তিকে সমর্থন করেছিলো এবং রাষ্ট্রপতির মতের পক্ষে ছিলো। কমিউনিস্টরা এসব ফতোয়া একত্র করেছিলো এবং এ-ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলো, আমরা কি তোমাদের বলি নি যে, ধর্ম হলো চেতনানাশক, ধর্ম জাতির জন্য আফিম।

মুসলমানদের জিহাদ পরিত্যাগ করা

মুসলমানেরা কঠিন আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাকে গনিমত ভেবে সন্তুষ্ট থেকেছে এবং পার্থিব জীবনের প্রতি প্রচণ্ড ঝুঁকে পড়েছে। তারা বিশ্বকে সম্রাটের সামনে ছেড়ে দিয়েছে, সে এটিকে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছা খেলছে। এসব কর্মকাণ্ড যাঁরা জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যবসা করেন তাঁদেরকে জাতির নেতা হয়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে। ফিলিস্তিনি বিপ্লবে এ-ব্যাপারে অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুসলমানেরা যখন পশ্চদ্‌পদ হয়েছে তখন কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে এবং মাতৃভূমির জন্য আত্মগর্বী মুসলিম সন্তানেরা তাদের পতাকাতলে জড়ো হয়েছে। আর জর্জ হাবাশ ও নায়াফ হাওয়াতমাহ্‌ তাদের মাথা নিয়ে ব্যবসা করেছেন, তাদের করোটির ওপর মর্যাদার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন এবং তাদের রক্তে ইতিহাস ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষ প্রকল্পের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশে অনেক যুবক উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলো এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পতাকাতলে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলো। তারা ধারণা করেছিলো যে, যে-ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের রক্ত চুষে নিচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দলগুলো খুব দ্রুতই তাদের স্বর ও আওয়াজ উচ্চ করেছে, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার করেছে এবং তাদের অনুসারীদের কাছে তাদের পথ ও পন্থা প্রকাশ করেছে : তারা ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু মানবাত্মার জন্য অবশ্যই একটি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হয়, যে-বিশ্বাসকে সে লালন করে এবং তার অবশ্যই মানুষ, পৃথিবী ও জীবনের প্রতি সুনির্দিষ্ট আদর্শ থাকতে হয়। জাতীয়তাবাদী দলগুলো এই বিশ্বাস ও আদর্শকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। অবশেষে তারা বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও নাস্তিক্যবাদী মার্কসীয় বিশ্বাস দ্বারা তাদের শূন্যতা পূরণ করে। কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়াই আপনার পক্ষে বলা সম্ভব : আরব ও ইসলামি বিশ্বে সমস্ত জাতীয়তাবাদী দল সত্তা ও প্রকৃতিগত দিক থেকে কমিউনিস্ট; কিন্তু নাম ও বেশভূষায় জাতীয়তাবাদী।

১৯৬৭ সালের ২৭ শে এপ্রিল পুনর্জাগরণবাদী ইবরাহিম খাল্লাস বলেন, 'আরব সভ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং আরব সমাজকে বিনির্মাণ করার পথ একটাই : নতুন আরব সমাজতান্ত্রিক মানুষ সৃষ্টি করা যারা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ, ধর্ম, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ এবং অতীত সমাজের নিয়ন্ত্রণ যাবতীয় মূল্যবোধ ইতিহাসের জাদুঘরে মমিকৃত মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়।'

আলি নাসিরুদ্দিন তাঁর قضية العرب গ্রন্থের টীকায় (পৃষ্ঠা ৩৮) বলেন, 'যদি প্রত্যেক যুগের জন্য পবিত্র নবুওত থেকে থাকে, তবে আরব জাতীয়তাবাদই হলো এই যুগের নবুওত।'

তাদের এক সমাজতান্ত্রিক কবি বলেন—

آمنت بالبعث ربا لا شريك له   وبالعروبة دينا ما له ثاني

'আমরা আন্দোলনকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছি যার কোনো শরিক নেই এবং অভ্যুত্থানকে ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছি যার কোনো বিকল্প নেই।'[৬৮]

---

[৬৮] এই মতাদর্শের কবিরা সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে ইসলামের ওপর প্রধান্য দিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। তার আরো কিছু নমুনা : (سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً

বিপ্লবের ক্ষেত্রে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রগুলোর প্রাচ্যীয় বিশ্বের প্রতি মুখাপেক্ষিতা

যে-বিশ্বঅঞ্চলের অধিবাসীরা মুসলমান তার অধিকাংশ রাষ্ট্রই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও প্রাচ্যীয় কমিউনিস্ট রাষ্টসমূহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবে—বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তির বিপ্লবের ক্ষেত্রে—বেশ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখায় এবং তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, শাহাদাতে বিশ্বাসীদের মাধ্যমিক স্তরে যারা ছিলো উজ্জ্বল ও উন্নত দৃষ্টান্ত তাদের লাল আগুনের চুল্লিতে নিক্ষেপ করে। তারা লাল আগুনের চুল্লি থেকে চিকিৎসাবিদ্যার সনদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে তার বিনিময়ে বিসর্জন দেয় শাহাদাত—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—এবং ধারণ করে মার্কসীয় নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা। ফলে মুসলিম দেশগুলোতে পার্টির দৃশ্য দেখা যায়, কমিউনিজমের দৃশ্য দেখা যায়। এভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের হাতেই নিজেদের সভ্যতাকে ধ্বংস করে, নিজেদের হাতে ও নিজেদের সন্তানদের হাতেই নিজেদের ঘরবাড়ি বরবাদ করে, অথচ গোটা ব্যাপারটা ঘটে তাদের অজ্ঞতাসারে। যদি আপনি আশ্চর্যান্বিত হন, তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো রাষ্ট্রগুলোর তাদের তাড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা :

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له   إياك إياك أن تبتل بالماء

'তাকে হাত-পা বেঁধে সাগরে নিক্ষেপ করলো এবং বললো, সাবধান, তুমি পানিতে ভিজবে না।'

সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে অবস্থানকালে দুই লাখেরও বেশি আফগান শিশুকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে কমিউনিজমের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়। সেই শিশুরা এখন (রমজান, ১৪০৯ হিজরি) মার্কস ও লেনিনের মতাদর্শের পক্ষাবলম্বনে এবং কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীকের পক্ষে মুজাহিদদেরে বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিকৃষ্ট যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

(بعده لجهنم) কুফ্‌রিকে জানাই সালাম, তা আমাদের ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তারপর জাহান্নামকে জানাই অভিনন্দন। (لا تسل عن ملتي أو مذهبي أنا بعثي اشتراكي عربي) আমার ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না; আমি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী আরব।

চূড়ান্ত কথা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى () وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (سورة طه)

"যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ[৬৯] অবস্থায়।" [সুরা তোয়াহা : আয়াত ১২৪]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة النحل)

"যে-কোনো পুরুষ বা নারী সৎকাজ করবে এবং সে মুমিন, অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবন দান করবো। আর তাদের সৎ কাজের বিনিময়ে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রতিদান দেবো।" [সুরা নাহ্‌ল : আয়াত ৯৭]

কমিউনিজমের পতন ঘটেছে। কারণ তা ছিলো মানবরচিত মতাদর্শ। [ফরাসি সমাজতান্ত্রিক নেতা জাঁ জরেস[৭০] বলেন, 'সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আত্মার হিসাব-নিকাশকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। আর তা নির্ভর করে অভ্যন্তরীণভাবে উচ্চ পর্যায়ের খোদাভীরুদের উপস্থিত থাকার ওপর।] মানবরচিত যে-কোনো মতাদর্শই আল্লাহর নীতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, পতনই হয়েছে তাদের পরিণাম। কারণ, মানবরচিত মতাদর্শ মানবপ্রকৃতির ওপর ভেঙে-চুরে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (سورة إبراهيم)

---

[৬৯] কিয়ামতে প্রথম পর্যায়ে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে, পরে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে।

[৭০] জাঁ জরেসের (১৮৫৯-১৯১৪) পুরো অগুস্ত ম্যারি জোসেফ জাঁ লিয়োঁ জরেস (Auguste Marie Joseph Jean Léon Jaurès)। ফ্রেঞ্চ স্যোশালিস্ট পার্টির নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গুপ্তহত্যার শিকার। জরেসের বিখ্যাত গ্রন্থ : Action Socialiste, ১৮৯৯।

'কুবাক্যের (কুফরি কথা) তুলনা একটি মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ২৫]

মানুষ যদি সুখী হতে চায় তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে।

মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামরত মুসলিম জামাতের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বকে পেতে চায় তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর ধর্মাদর্শের দিকে ফিরে আসতে হবে।

মানুষ যদি তার আত্মায় প্রশান্তি চায়, তার অস্তিত্বে স্বস্তি চায় এবং গভীরভাবে জীবনের স্বাদ পেতে চায় তবে অবশ্যই তাকে তার স্রষ্টার অভিমুখী হতে হবে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة الروم)

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর প্রকৃতির[৭১] অনুসরণ করো, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" [সুরা রুম : আয়াত ৩০]

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ () الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (سورة الرعد)

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়; যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।" [সুরা রা'দ : আয়াত ২৮-২৯]

আল্লাহর দিকে ফিরে আসার নীতিমালা

১. যে-ইসলামি জামাত ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা অর্থাৎ তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের সঙ্গে কাজ করা; এমন ইসলামি জামাতের বিরুদ্ধে বিশ্বে কী কী

---

[৭১] فطرة অর্থ প্রকৃতি। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে-সহজাত প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা-ই فطرة الله। আর এই ফিতরাতুল্লাহই ইসলাম। হাদিসে বলা হয়েছে— مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ : অর্থাৎ, প্রত্যেক মানবশিশু এই সহজাত স্বভাব (ইসলাম) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখা; ইসলামি জামাতে সঙ্গে যুক্ত সন্তানদের তাওহিদের ওপর তারবিয়ত করা; নফল আমলসমূহে গুরুত্ব প্রদান করা।

২. ইসলামি জামাত জিহাদ শুরু করবে; তারা হবে মুসলিম উম্মাহর শক্তি বিস্ফোরিত করার জন্য বজ্রাঘাতের মতো।

৩. ইসলামি জামাত যে-সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে তা অব্যাহত থাকবে।

৪. আল্লাহর অনুগ্রহে ইসলামি আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম জাতির বিজয় লাভ এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই এই সংগ্রাম শেষ হবে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ব্যক্তিপরিচিতি

রাসপুটিন

গ্রেগরি এফিসোভিচ রাসপুটিন (১৮৭১-১৯১৬) : রাশিয়ার কৃষক বংশোদ্ভূত একজন মরমি সন্ন্যাসী। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার রাজকুমার সারেভিচ অ্যালেক্সি (১৯০৪-১৯১৮) কঠিন রোগাক্রান্ত হলে রাসপুটিন সম্মোহনের মাধ্যমে তাকে সারিয়ে তোলেন। এর ফলে জার ও জারিনা তাঁকে প্রতিশ্রুত ত্রাণকারী মাহদি বলে বিবেচনা করতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে রাসপুটিন অত্যন্ত বদরাগী, বিকৃতরুচি ও দুশ্চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও জার ও জারিনার ওপর তাঁর প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন পদসমূহে নিয়োগ ইত্যাদিও নির্ধারিত হতো রাসপুটিনের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী। মদ্যপ রাসপুটিনের যৌন যথেচ্ছাচার সেন্ট পিটার্সবার্গের সমাজে তাঁকে খুবই ঘৃণ্য করে তোলে এবং পত্রপত্রিকায়ও এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়। রাজপরিবারের সদস্য, আমাত্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ রাসপুটিনের কবল থেকে মুক্তির জন্য পথ খুঁজতে থাকেন। ১৯১৬ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর রাজপুত্র ইউগুপোভ তাঁকে তীব্র আর্সেনিক বিষমিশ্রিত কেক খাইয়ে দেন। কিন্তু এই অতি উচ্চ মাত্রার বিষেও তাঁর মৃত্যু না ঘটায় তাঁকে গুলি করে বহু কষ্টে হত্যা করা হয় এবং তাঁর মৃতদেহকে একটি নদীতে ফেলে দেয়া হয়। রাসপুটিনের প্রভাব চার্চ ও রাজতন্ত্রকে জনগণের কাছে ঘৃণিত করে তোলে। এখনো কোনো সরকার বা সরকার-প্রধানের ওপর অনভিপ্রেত প্রবল প্রভাব সৃষ্টিকারীদের রাসপুটিন বলে অভিহিত করা হয়।

জর্জ হাবাশ

জর্জ হাবাশ (جورج حبش) আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (PFLP)-এর নেতা। ধর্ম: অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তাঁর আরো দুটি নাম আল-হাকিম ও আবু মায়সা। মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ ও নাসেরিজম দ্বারা প্রভাবিত। ১৯২৬ সালের ২রা আগস্ট ফিলিস্তিনের আল-লুদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াফা ও কুদসে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৪ সালে বয়রুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা অনুষদে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে চূড়ান্ত ডিগ্রি অর্জন করেন। জর্জ হাবাশ মুসলমানদের সংগ্রামকেই ফিলিস্তিন-পুনরুদ্ধারের একমাত্র

উপায় বিবেচনা করেন। তিনি আরব সংহতি ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আরব গেরিলা বাহিনী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। ছাত্র সংগঠন আল-উরওয়াতুল উসকার অন্যতম প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (ANM) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে জর্ডানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের অভিযোগে তাঁর দল অভিযুক্ত হয়। ফলে তিনি দামেস্কে চলে যান এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ-সময় আবদুন নাসেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯৬৭ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর পরাজয়ের পর তিনি পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন গঠন করেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর সংগঠন ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। ২০০৮ সালের ২৬ শে জানুয়ারি আম্মানে মৃত্যুবরণ করেন জর্জ হাবাশ।

নায়াফ হাওয়াতমাহ

নায়াফ হাওয়াতমাহ (نايف حواتمة) ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (DFLP)-এর মহাসচিব। ধর্ম: ক্যাথলিক খ্রিস্টান। মার্ক্সবাদ দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৩৫ সালে জর্ডানের সালাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়রুত থেকে সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনে লেসান্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৪ সালে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। জর্ডানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর বাদশাহ হুসাইন তাঁর দণ্ড মওকুফ করেন। জর্জ হাবাশের সঙ্গে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন-এর নেতৃত্বে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে-দল ত্যাগ করে এসে গণতান্ত্রিক জোট প্রতিষ্ঠা করেন। নায়িফ হাওয়াতমা ১৯৭৩ সালে পশ্চিমতীর, গাজা এবং অন্যান্য অঞ্চল মিলিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তিনি ফিলিস্তিন-সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইসরাইলের সঙ্গে আলোচনায় বসার কারণে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন (PLO)-এর রাজনীতির বিরোধিতা করেন এবং দামেস্কে এ-আলোচনার বিরোধিতাকারী আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলেন। ১৯৬৭ সালের পর ২০০৭ সালে প্রথম বারের মত তিনি PLO-এর বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে পশ্চিতীরে যাওয়ার অনুমতি পান।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সহিহুল বুখারি, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আল-বুখারি রহ;

২. মুসনাদুল ইমাম আহমদ, আহমদ বিন হাম্বল আশ-শাইবানি রহ., আল-মাকতাবুল ইসলামি থেকে মুদ্রিত;

৩. আল-ইসলাম ও মুশকিলাতুল হাদারাহ (ইসলাম ও সভ্যতার সঙ্কট), সাইয়িদ কুতুব রহ.;

৪. খাসায়িসুত্ তাসাওউরিল ইসলামি (ইসলামি চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য), সাইয়িদ কুতুব রহ.;

৫. দিরাসাতুন কুরআনিয়্যাহ (কুরআনের শিক্ষা) সাইয়িদ কুতুব রহ.;

৬. আল-মুসতাকবালু লি হাযাদ্-দীন (এই দীনের ভবিষ্যৎ), সাইয়িদ কুতুব রহ.;

৭. আল-ইসলাম ওয়ান নুযুমুল মুআসিরাহ (ইসলাম ও আধুনিক জীবনব্যবস্থা), বক্তৃতাসংকলন, উশমাবি সুলাইমান;

৮. আল-ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা (ইসলামের চ্যালেঞ্জ), ওয়াহিদুদ্দিন খান;

৯. আফয়ুনুশ শুউব, (জাতির আফিম) আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ;

১০. The Opium of the Intellectuals, Raymond Aron;

১১. আল-আফআল ইয়াহুদিয়্যাহ ফি মাআকিলিল ইসলাম (ইসলামের দুর্গে ইহুদি সাপ), আবদুল্লাহ আত-তাল;

১২. আল-ইনদিহারুল মার্কসি ফিল আলামিল ইসলামি, নাসিল আল-আরাবি;

১৩. আত-তারিখুস সিররিয়্যু লিল-আলাকাতিলশ শুয়ুয়িয়্যাহ আস-সাহয়ুনিয়্যাহ, (জায়নবাদ/ইহুদিবাদ ও কমিউনিজমের আঁতাতের গুপ্ত ইতিহাস), নাহহাদ আল-গাদেরি;

১৪. আত-তাফসিরুল ইসলামিয়্যু লিত্-তারিখ (ইতিহাসের ইসলামি ব্যাখ্যা), ড. ইমাদুদ্দিন খলিল;

১৫. তাফসিরুত্ তারিখ (ইতিহাসের ব্যাখ্যা), আবদুল হামিদ সিদ্দিকি;

১৬. তাহাফুতুল আলমানিয়্যাহ (ধর্মনিরপেক্ষতার পতন), ড. ইমাদুদ্দিন খলিল:

১৭. তাহাফুতুল ফিকরিল মাদ্দিয়্যি (বস্তুবাদী চিন্তাধারার পতন), ড. মুহাম্মদ আল-বাহি;

১৮. জুযুরুল বালা, আবদুল্লাহ আত্-তাল;

১৯. দাওরুদ দুওয়ালিল ইশতিরাকিয়্যাহ ফি তাকবিনি ইসরাইল (ইসরাইল প্রতিষ্ঠায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা) ড. ইবরাহিম আশ-শারিকি;
২০. State at the Stage of Birth, David Horvitz;
২১. আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ ওয়ালিদাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ (কমিউনিজম জায়নবাদের সন্তান), আহমদ আবদুল গাফ্ফার আল-আত্তার;
২২. Communism and Zionism, Frank Lollar Britton;
২৩. আস-সানামুল লাযি হাওয়া, পাশ্চাত্যের ছয়জন লেখক কর্তৃক লিখিত, আরবি অনুবাদ : ফুয়াদ হাম্মুদা;
২৪. আস-সিরাত্মু বাইনাল ইলমি ওয়াল ফালসাফাহ (জ্ঞান ও দর্শনের দ্বন্দ্ব), ড. তাওফিক আত্-তাবিল;
২৫. Protocols of Jews Leaders, আরবি অনুবাদ : আত-তিউনিসি;
২৬. Secret World Government or The Hidden Hand (1926), Arthur Cherep-Spiridovich;
২৭. মা যা খাসিরাল আলামু বিন-হিতাতিল মুসলিমিন, (মুসলমানদের অধঃপতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?) সাইয়িদ আবুল হাসান আলি আন-নদবি রহ. (গ্রন্থটি বাংলাসহ একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।)
২৮. ফাতাওয়া আন আশ-শুয়ুয়িয়্যাহ, (কমিউনিজম সম্পর্কে ফতোয়া), ড. আবদুল হালিম মাহমুদ;
২৯. Marxism in the Twentieth Century, Roger Garaudy (১৯৭০), আরবি অনুবাদ : নাযিহ আল-হাকিম;
৩০. মা হুওয়াল গারবু, রাশেদ আল-গানুশি;
৩১. মুহাকিমুত তাফতিশ, ড. আলি মাযহার;
৩২. আল-মুখাত্তাতাতুস সাহয়ুনিয়্যাহ আত-তালমুদিয়্যাহ আল-ইয়াহুদিয়্যাহ ফি গাযবিল ফিকরিল ইসলামি, আনওয়ার আল-জুনদি;
৩৩. Entrance to Israel, Alan Taylor;
৩৪. আল-মুসলিমুনা ওয়াল হারবুর রাবিয়া (মুসলিম জাতি ও চতুর্থ যুদ্ধ), যুহদি আল-ফাতেহ;
৩৫. আল-মুসলিমুনা তাহতাস সাইতারাতিশ শুয়ুয়িয়্যাহ (কমিউনিজমের নিয়ন্ত্রণাধীন মুসলমান), মাহমুদ শাকির;

৩৬. আল-মুসলিমুনা ফিল ইত্তিহাদিস সুফিয়াতি/ Muslims in the Soviet Union, (দুই ফরাসি লেখক) শাঁতাল কালকাজি এবং আলেকজান্ডার বেনিগিশ, আরবি অনুবাদ : ইহসান হাক্কি;
৩৭. মাকায়িদু ইহুদিয়্যাহ ইবারাত তারিখ (যুগে যুগে ইহুদি ষড়যন্ত্র) আবদুর রহমান হানবাকা;
৩৮. হাযিহিশ শুয়ুয়িয়্যাহ ফিল আলামিল আরাবি, আবদুল হাফিয মুহাম্মদ;
৩৯. নাকদুল আউহামিল জাদালিয়্যাতুল মাদ্দিয়্যাহ, ড. মুহাম্মদ সাঈদ রহমযান আল-বুতি।

সাময়িকী

৪০. আল-বালাগ, কুয়েত থেকে প্রকাশিত সামায়িকী;
৪১. আল-গুরাবাউল ইসলামিয়্যাহ, ব্রিটেনের জাময়িয়্যাতুত তালাবাতিল মুসলিমিনা (মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব ব্রিটেন) কর্তৃক প্রকাশিত;
৪২. আল-মা'রিফা, তিউনিসিয়া থেকে প্রকাশিত সাময়িকী ।

পরিশিষ্ট
গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

বস্তু : Matter

চেতনায় প্রতিফলিত বটে, কিন্তু চেতনানিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্বকে বস্তু বলে। বস্তুর প্রকাশ অসংখ্য। সর্বপ্রকার প্রকাশ, বিভিন্ন প্রকাশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, গতি সবকিছুর ধারক হলো বস্তু। গতি আর বস্তু ভিন্ন সত্তা নয়। গতিময়তা হলো বস্তুর অচ্ছেদ্য চরিত্র। কাজেই বিশেষ প্রকাশের বাইরে গতিহীন অনড় কোনো নির্বিশেষে বস্তুকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। বস্তুর বিচিত্র প্রকাশকে তাদের গতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জানাই হলো বস্তুকে জানা। বস্তু নিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে। বস্তুর বিবর্তনে যেমন চেতনার উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি চেতনার শক্তি বস্তুর বিবর্তনে এবং বস্তুর বৈচিত্র্যের বৃদ্ধিতে একটি মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। বস্তুর বিকাশের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তুলনামূলকভাবে সহজ থেকে জটিলতা প্রাপ্তি। বস্তুর বিকাশ যত জটিল, তত বিচিত্র তার প্রকাশ এবং তাদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক।

চেতনা বস্তুর বিকাশের ফল হলেও চেতনা ও বস্তুর চরিত্র এতবেশি পরস্পরবিরোধী যে, এই বিরোধিতার ভিত্তিতে ভাববাদী দার্শনিকগণ চেতনাকে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বস্তুর চেয়েও আদি ও মূলসত্তা বলে দাবি করেন। ভাববাদী দার্শনিকদের অনেকের মতে চেতনা যে কেবল অ-বস্তু তা-ই নয়, বরং চেতনাই বস্তুর মূল। বস্তু চেতনারই প্রকাশ বা বস্তু চেতনার কল্পনামাত্র। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে বস্তু ও চেতনার মধ্যকার বিরোধিতা আপেক্ষিক। বস্তু ও চেতনার মধ্যে চরম কোনো বিরোধিতা থাকতে পারে না। বস্তুর সঙ্গে চেতনাসম্পন্ন মানুষের যে-সম্পর্ক তাতে মানুষ তার পরিবেশকে নিয়ত পরিবর্তিত করে বস্তুর নতুনতর প্রকাশের এবং তাদের নতুনতর সাংগঠনিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম এবং তা ঘটাচ্ছে। উৎপাদনের নতুনতর উপায়, দালানকোঠা ও ঘরবাড়ি তৈরি, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বিধানসমূহের প্রয়োগে নতুনতর দ্রব্যসামগ্রীর সৃষ্টি—এসবকিছুই প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর মানুষের চেতনার হস্ত ক্ষেপের পরিফল। বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশলকে মানুষ যত আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে, বস্তুর প্রকাশের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বস্তুবাদ : Materialism

বিশ্বকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুটি অভিমত মৌলিক ও প্রধান : একটি বস্তুবাদ, অপরটি ভাববাদ।

বস্তুবাদকে দুইভাবে বিভক্ত করে বিবেচনা করা যায় : সাধারণ বস্তুবাদ ও দার্শনিক বস্তুবাদ। সাধারণ বস্তুবাদ বলতে জগৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতবাদ বোঝায়। চারপাশের জগৎ সত্য না মিথ্যা, মায়া না যথার্থ—এ-সম্পর্কে মানুষের মনে আদিকাল থেকেই প্রশ্ন জেগেছে। সাধারণ মানুষ গভীর যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকেই জীবনযাপনের বাস্তব প্রয়োজনে জগৎ ও বাস্তবকে সত্য বলে মনে করেছে। কিন্তু জগতের বৈচিত্র্য ও প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ বস্তুবাদ যথেষ্ট নয়। এই সাধারণ বা স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ও পূর্ণতার বিশ্লেষণ ঘটেছে দার্শনিক বস্তুবাদে। জগৎ সম্পর্কে দার্শনিক বস্তুবাদের অভিমত এই যে, বস্তু এবং মন বা ভাবের মধ্যে বস্তু হলো প্রধান; মন, চেতনা এবং ভাব অপ্রধান। এর অনুসিদ্ধান্ত হলো বিশ্বজগৎ অবিনশ্বর ও শাশ্বত। ঈশ্বর বা অপর কোনো বহিঃশক্তি বিশ্বের স্রষ্টা নয়। স্থান ও কাল উভয় দিক থেকে বিশ্ব অসীম। কোনো বিশেষ সময় বা কালে যেমন বিশ্বকে অপর কেউ সৃষ্টি করে নি, তেমনি স্থানিক সীমা বলেও বিশ্বের কোনো সীমা নেই। বিশ্ব হলো বস্তু। চেতনা বিশ্বের বিবর্তনের ফল। চেতনা বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া। চেতনা যখন বিশ্বের সৃষ্টি তখন বিশ্ব চেতনার অজ্ঞেয় নয়।

বস্তুবাদ কোনো কাল্পনিক অভিমত নয়। কোনো যুগের বৈজ্ঞানিক বিকাশের সূত্রাকার বিবরণই বস্তুবাদ। বিজ্ঞানের বিবরণ যেমন বস্তুবাদ, তেমনি বস্তুবাদ বিজ্ঞানের অগ্রগতিরও হাতিয়ার। তাই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ উভয়ই নিরন্তর বিকাশ লাভ করছে। বস্তুবাদের জন্ম ও বিকাশ কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রাচীন ভারত, চীন ও গ্রিসের দাসভিত্তিক সমাজে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক অন্যান্য জ্ঞানসূত্র বিকাশ লাভ করার ফলে বস্তুবাদ প্রথম জন্মলাভ করে। প্রাচীনকালের এই বস্তুবাদ জগৎ-সংসারের সমস্যাবলির ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই অতিসহজ বা প্রাথমিক চরিত্রের ছিলো। বস্তুজগৎ মননিরপেক্ষভাবেই অস্তিত্বসম্পন্ন—এই ছিলো প্রাচীন বস্তুবাদের ধারণা। জগতের বৈচিত্র্যের মূলে কোনো একক নিশ্চয়ই আছে এবং সে-একক অবশ্যই বস্তু।

প্রাচীন বস্তুবাদীদের মধ্যে চীনের লাওজু, ওয়াং চুং, ভারতের চার্বাকমত, গ্রিসের হিরাক্লিটাস, অ্যানাক্সাগোরাস, এমপিডোকলিস, এপিকিউরাস প্রমুখ দার্শনিকের নাম সুপরিচিত। লিউসিপাস, ডিমোক্রিটাস প্রমুখ প্রাচীন বস্তুবাদী দার্শনিক বিচিত্র বস্তুর মূল হিসেবে এক বা একাধিক অণুর অস্তিত্বও কল্পনা করেছিলেন। প্রাচীন বস্তুবাদের একটা অসম্পূর্ণতা এই ছিলো যে, প্রাচীন বস্তুবাদের পক্ষে বস্তু এবং মনের পার্থক্য এবং তাদের সম্পর্কের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নি। প্রাচীন বস্তুবাদ মন বা চেতনার সকল বৈশিষ্ট্যকেই বস্তুর প্রকারভেদ বলে ব্যাখ্যা করতে চাইতো। কিন্তু মন ও চেতনা একটা জটিল সত্তা। তাকে কেবল বস্তুর প্রকারভেদ বললে তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মনসহ সবকিছুই বস্তু— কেবল এই তত্ত্ব দ্বারা জগতের জটিল বিকাশকে ব্যাখ্যা করা এবং মানুষের অগ্রগতির উপায় হিসেবে জ্ঞানকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়।

ইউরোপের মধ্যযুগে বস্তুবাদ ধর্মীয় প্রকৃতিবাদের রূপ গ্রহণ করে। সর্ববস্তুতে ঈশ্বর প্রকাশিত এবং প্রকৃতি ও ঈশ্বর উভয়ই নিত্যসত্য—এই অভিমতের মাধ্যমে বস্তুবাদ এই যুগে আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে বস্তুবাদের পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশ ঘটে। অর্থনীতিক উৎপাদন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি কৌশলের উন্নতির পরিবেশে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বস্তুবাদ মধ্যযুগের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই পর্যায়ের বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বেকন, গ্যালিলিও, থমাস হবস, গাসেন্দি, স্পিনোজা ও জনলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্যায়ে বস্তুবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস এবং প্রকৃতিকে মূল সত্তা ধরে ধর্মীয় অত্যাচার ও যাজক-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সময়ের প্রধান বিকাশ ঘটে গণিত ও বলবিদ্যায়। বিজ্ঞানের এই দুই শাখার ওপর নির্ভর করাতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেয় যান্ত্রিকতা। চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগসূত্র প্রকাশে এই বস্তুবাদ ব্যর্থ হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক ডিডেরট, হেলভেটিয়াস, হলবাখ এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়াস পান। এর পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের প্রকাশ দেখা যায়। বস্তুবাদের পূর্ণতর বৈজ্ঞানিক বিকাশ ঘটেছে উনবিংশ শতকের কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিখ এঙ্গেল্‌স ও লেনিনের দার্শনিক চিন্তাধারায়।

দ্বন্দ্বতত্ত্ব : Dialectics

এই তত্ত্বের মূলকথা এই যে, সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মধ্যেই দুটি বিপরীত সত্তার অস্তিত্ব বিরাজমান। এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তু বা ঘটনার বিকাশ ঘটে, পরিবর্তন ঘটে। ইতিবাচক দিক ও নেতিবাচক এবং অবক্ষয়মান দিক ও বিকাশমান দিক—এর মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম চলতেই থাকে। এক দ্বন্দ্বের অবসান হলে শুরু হয় নতুন দ্বন্দ্ব; বস্তুত দ্বন্দ্বই হলো চিরন্তন এবং মীমাংসা বা স্থিতি হলো আপেক্ষিক। মার্কসবাদের মতে, দ্বন্দ্বতত্ত্বের মৌলিক সূত্র তিনটি : ১. বিপরীত সত্তার অন্তর্মিলন ও দ্বন্দ্ব (Interpenetration and Contradiction of Opposites); ২. পরিমাণের গুণগত পরিবর্তন (Qualitative Change of Quantity) এবং ৩. নিরাকরণের নিরাকরণ (Negation of Negation)। বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব যখন বাড়ে তখন সংঘটিত হয় গুণগত পরিবর্তন এবং এর ফলে পূর্বসত্তার নিরাকরণ বা অবসান হয়ে নতুন সত্তার উদ্ভব ঘটে।

এই দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। অণুতে যেমন রয়েছে ইলেকট্রন প্রোটন, বিদ্যুতে যেমন রয়েছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক, চুম্বকে যেমন রয়েছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সৃষ্টিতে যেমন রয়েছে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ, সমাজেও তেমনি রয়েছে শোষক ও শোষিত, উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্ক ইত্যাদি। প্রকৃতি জগতের মতোই সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (যেমন—দাস ও দাসমালিকের দ্বন্দ্ব, সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের দ্বন্দ্ব, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রশক্তির সঙ্গে মানবশ্রমের দ্বন্দ্ব)-এর ফলেই এক-একটি সমাজকাঠামো ভেঙে নতুন সমাজের সৃষ্টি হয়। বস্তুত, যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সক্রেটিসই প্রথম দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল একটি নতুন বিশ্লেষণপদ্ধতি হিসেবে দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশ সাধন করেন। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স একে তাঁদের দর্শনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং প্রমুখ এর বিকাশ সাধন করেন।

দ্বন্দমূলক/ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ : Dialectical Materialism

প্রাকৃতিক জগৎ, মানুষের সমাজ ও চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল বিধানাবলির পরিচয়জ্ঞাপক তত্ত্ব। মার্কসীয় মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ইংরেজি 'ডায়ালেকটিস' শব্দ গ্রিক শব্দ 'ডায়ালগ' থেকে উদ্ভূত। গ্রিক দর্শনে ডায়ালগ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে

সমাধান সন্ধানের পদ্ধতিকে গ্রিক দার্শনিকরা ডায়ালগ বলতেন। প্রশ্ন, উত্তর বা পাল্টা প্রশ্নের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের অবস্থা বিরাজমান। এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছার প্রক্রিয়ায় একটা গতির আভাস বিদ্যমান। বস্তুত দ্বন্দ্ব, পরিবর্তন, গতি—এই কথাগুলো পরস্পরের ইঙ্গিতসূচক। যেখানে দ্বন্দ্ব আছে, সেখানে পরিবর্তন ও গতি আছে। প্রাচীন গ্রিসের একাধিক বস্তুবাদী দার্শনিক জগৎ সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যায় এই দ্বন্দ্ব, গতি ও পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন। প্লেটো ইতিহাসের অন্যতম ভাববাদী দার্শনিক হলেও তাঁর সংলাপসমূহ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির উত্তম দৃষ্টান্ত। দ্বন্দ্ব কেবল প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে নয়; তাঁর সংলাপে এমন আভাসও পাওয়া যায় যে, 'ভাব' বা 'চরম সত্তা'কেও নির্দ্বান্দ্বিকভাবে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায় না। 'চরম সত্তা' একদিক দিয়ে যেমন অস্তিত্ব, তেমনি অপরদিক দিয়ে সে অনস্তিত্ব; একদিকে সে যেমন নিজে যা তা-ই, তেমনি সে নিজে যা নয় তা-ও বটে। সে অপরিবর্তনীয়, আবার পরিবর্তনীয়। যে-কোনো অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে অস্তিত্বের মূল বলে স্বীকৃতি দান এবং জগৎ, সমাজ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার ব্যাপকতম প্রয়োগ ঘটেছে আধুনিক কালে মার্কসীয় দার্শনিকদের দ্বারা। ১৮৪০ সালে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব হাজির করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিকতার পূর্ণতম ব্যাখ্যা হেগেল-এর দর্শনে ঘটেছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রাচীন দর্শনের পর হেগেলই দ্বান্দ্বিকতার নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। হেগেলের মতে আমাদের চিন্তাই যে কেবল অস্তি, নাস্তি এবং নাস্তির নাস্তিত্বের মাধ্যমে নতুনতর অস্তির উদ্ভবের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয় তা-ই নয়, চরম সত্তাও অনুরূপ অস্তির ও নাস্তির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নিজের সত্তাকে সৃষ্টি করে চলে। মার্কস ও এঙ্গেলস হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও তাঁরা হেগেলের দর্শনকে গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে হেগেল একদিকে যেমন দ্বান্দ্বিক গতিকে স্বীকার করেছেন, অপরদিকে তেমনি চরম সত্তাকে ভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে বস্তু চরম ভাবের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার প্রকাশবিশেষ, বস্তু চরম সত্তা নয়। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স হেগেলের এই ভাববাসী তত্ত্বকে বর্জন করে ঘোষণা করেন যে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি সতত এবং সর্বত্র যেমন ক্রিয়াশীল তেমনি চরম সত্তা হলো বস্তু, ভাব নয়। ভাব হলো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ক্রিয়াশীল বস্তুরই বিকাশবিশেষ। এদিক থেকে মার্কবাস হেগেলের দর্শনের সম্পূর্ণ প্রতিপক্ষ।

কাজেই হেগেলীয় ডায়ালেকটিস বা দ্বান্দ্বিকতার সঙ্গে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতার পার্থক্য আছে।

মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা বস্তুর ক্রিয়াশীলতা ও জ্ঞানের ক্রিয়াশীলতাকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে। বস্তু এবং বস্তুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করা যায় : বস্তুর মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। দ্বন্দ্ব থেকে গতির সঞ্চার। দ্বন্দ্বহীন এবং গতিহীন কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই। দ্বন্দ্বমূলক গতিকে একটা বিশেষ অবস্থা থেকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, একটা বিশেষ অবস্থাকে যদি 'অস্তি' বলে বিবেচনা করা যায়, তা হলে দ্বন্দ্ব এবং গতির কারণে কালক্রমে 'অস্তি' নাস্তির সৃষ্টি করে; অস্তি ও নাস্তির সংগ্রামে কালক্রমে আবার নতুনতর অস্তিত্বের সৃষ্টি হয় যার অস্তি ও নাস্তির অভিনব ও উন্নততর সম্মিলন সংঘটিত হয়। ইংরেজিতে এই তিনটি অবস্থা 'থিসিস', 'অ্যান্টিথিসিস' ও 'সিনথেসিস' বলে পরিচিত। দ্বান্দ্বিক গতির আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিবর্তনের ক্রম সবসময় একরকম থাকে না। পরিবর্তনের ক্রম বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে অবস্থার ক্ষেত্রে একটা গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে।

মার্কস ও এঙ্গেল্স বস্তুর ক্ষেত্রে এই দ্বান্দ্বিকতার নীতি প্রয়োগ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দ্বারা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। মার্কসবাদীগণ আদি সাম্যবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের উত্তরণকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। এই নীতিতে কালক্রমে পুঁজিবাদী সমাজ নতুনতর সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হবে বলেও মার্কস ও এঙ্গেল্স ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ : Historical Materialism

মার্কসবাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়। মানবসমাজের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায়, মানুষের সামাজিক জীবনের ইতিহাসের মূল শক্তি হলো মানুষের জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম। মানুষ তাঁর জীবন ধারণ করে জীবন রক্ষার উপাদানসমূহ সংগ্রহ ও সৃষ্টির দ্বারা। এজন্য তার হাতিয়ার আবশ্যক। এই হাতিয়ার বা উপায়কে মার্কসবাদে উৎপাদনের শক্তি বা 'ফোর্সেস অব প্রোডাকশন' বলা হয়। উৎপাদনের উপায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে

মানুষে মানুষে সম্পর্ক তৈরি হয়। এটা হলো উৎপাদন-সম্পর্ক বা 'প্রোডাকশন-রিলেশনস'।

আদিকালে মানুষের অস্তিত্ব একেবারে প্রকৃতি- ও পরিবেশ-নির্ভর হওয়ার কারণে জীবিকার উপায়সমূহ যৌথভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ এবং তার ফলকে যৌথভাবে ভোগ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিলো না। মানুষের আদিকালের এই যৌথ জীবন ও সমাজব্যবস্থাকে আদি সাম্যবাদী অবস্থা বা পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এমন অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে না। অধিকতর স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য মানুষ জীবন-ধারণের উপায়সমূহকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করে তোলে। উন্নততর উপায়সমূহ সকলের হাতে সমানভাবে না থাকার কারণে এ-ধরনের উপায় বা শক্তির মালিকগণ এ-ধরনের উপায় বা শক্তির মালিক নয় যারা তাদের থেকে অধিকতর শক্তিমান হয়ে ওঠে। শক্তিমানেরা শক্তিহীনদের দ্বারা উন্নততর উৎপাদন-উপায় প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহে সমর্থ হন। সংগৃহীত সম্পদকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য করতে থাকে। এভাবে আদিম যৌথ বা সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার মালিক এবং অ-মালিক, অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

মার্কসবাদী তত্ত্বে সমাজবিকাশের এই পর্যায়কে দ্বিতীয় পর্যায় বা দাসবাদী পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। এই দাসপর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পর্যায়ে শক্তিমান শ্রেণি শক্তিহীন দাসদের মাধ্যমে জীবনধারণের দ্রব্যসামগ্রী, সম্পদ ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিলো দাসভিত্তিক বা দাসদের শ্রমের শোষণভিত্তিক। এই দাসপর্যায় পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে একই সময়ে ছিলো কি-না এবং তার আয়ুষ্কালের পরিধি কোথায় কী পরিমাণ ছিলো তা তর্কসাপেক্ষ ও গবেষণার বিষয়। তবুও মার্কসবাদ দাসপর্যায়কে মানবসমাজের অতিক্রান্ত ইতিহাসের একটি সাধারণ পর্যায় বলে গণ্য করে। শস্য উৎপাদনের নতুনতর হাতিয়ারসমূহের উৎপাদন, দাসদের বিদ্রোহ ও নতুন উৎপাদনে দাসব্যবস্থা ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে প্রতিবন্ধক বলে বোধ হতে থাকার কারণে দাসব্যবস্থার স্থলে নতুন একটি অর্থনৈতিক পর্যায়ের উদ্ভব ঘটে। এটি সমাজবিকাশের ইতিহাসে তৃতীয় বা সামন্ত তান্ত্রিক পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে জমির শস্য ও জমির ওপর দখল সামাজিক জীবনের শক্তির আধার হয়ে দাঁড়ায়। জমির জবরদস্ত বা শক্তিমান মালিকদের সামন্তপ্রভু এবং কৃষিতে বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত কৃষকদের শুরুতে ভূমিদাস এবং পরবর্তীকালে কৃষক বলে অভিহিত করা

হয়। এই পর্যায়েও কোন দেশে কী অবস্থা ছিলো এবং এর কালপরিধি কী ছিলো সে সম্পর্কে এখনও গবেষণা চলছে।

কিন্তু ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সংঘটিত হয়। মাটির অভ্যন্তরে শক্তির আখর কয়লা আবিষ্কৃত হয়। দ্রব্যের উৎপাদন অধিকতরভাবে পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-বিনিময় তথা ক্রয়-বিক্রয়ের রূপ লাভ করে। শহরকেন্দ্রিক ও উন্নততর যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ ইউরোপের ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে পুঁজিভিত্তিক যন্ত্রশিল্প বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে উনবিংশ শতকে প্রধান ও প্রবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপ গ্রহণ করে। মানবসমাজের বিকাশের এই স্তরে চতুর্থ তথা পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। কার্ল মার্কসের মতে এর পরবর্তী বা পঞ্চম পর্যায় হলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

সমাজতন্ত্র : Socialism

কলকারখানা ও জমি হলো রাষ্ট্রের উৎপদানের উপায়। উৎপাদনের উপায়ের সমষ্টিগত মালিকানার ভিত্তিতে যে-আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে সমাজতন্ত্র বলে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক মালিকানা দুটি রূপ গ্রহণ করতে পারে : রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং সমবায়মূলক ও যৌথ মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণিশোষণের অবস্থান থাকতে পারে না। উৎপাদনে ও রাষ্ট্রীয় শাসনে নিযুক্ত শ্রমজীবী জনতা সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি বিধান করে। উৎপাদনের উন্নতি শ্রমিকদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়নে প্রতিফলিত হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতিগত বৈষম্য ও শোষণের অবসান ঘটে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জাতিগত বৈষম্যের মূল কারণ হলো উন্নত জাতির মালিকশ্রেণি অনুন্নত জাতিকে নিজেদের পণ্যের বাজার হিসেবে দেখে এবং অনুন্নত জাতির উন্নতিতে নিজেদের স্বার্থ বিপন্ন বলে বোধ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মুনাফা ভোগকারী কোনো শ্রেণির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এ-কারণে সমাজের কোনো অংশের উন্নতির সম্ভাবনা অপর কোনো অংশের স্বার্থের প্রতি আঘাত বলে গণ্য হতে পারে না। বরং সমাজের যে-কোনো অংশের উন্নতি অপর অংশকে উন্নত করে

তোলে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শুধু শেণিতে শ্রেণিতে নয়, শহরের সঙ্গে গ্রামের এবং মানসিক শ্রমের সঙ্গে দৈহিক শ্রমের বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শহর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গ্রামকে জীবনের অশিক্ষিত পশ্চাদ্‌পদ অংশ বলে বিবেচনা করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শহর ও গ্রামকে পরস্পরের পরিপূরক আর্থিক ও সামাজিক অঞ্চল হিসেবে উন্নত করে তোলে। গ্রামের কৃষি-অর্থনীতিকে যৌথ খামারের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতির প্রয়োগে ক্রমাধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ করে গ্রামবাসীর জীবনে অধিকতর অবকাশের সৃষ্টি করে গ্রামকে শহরবাসী ও গ্রামবাসী উভয়ের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

সমাজতন্ত্রে দুটি প্রধান শ্রেণির অস্তিত্ব থাকে : কারখানার শ্রমিক শ্রেণি এবং যৌথ খামারের কৃষকশ্রেণি। সমাজতন্ত্রের গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের অবশেষ হিসেবে বুদ্ধিজীবী বলে একটা শ্রেণির অস্তিত্ব থাকলেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বজনীনতার মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা আর পৃথক শ্রেণি বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে নাগরিকদের কার্যগত পার্থক্য থাকতে পারে : কেউ অফিসে, কেউ আদালতে, কেউ খামারে, কেউ বা কলকারখানায় কর্মরত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরস্পরবিরোধী কোনো অস্তিত্ব না থাকাতে সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের আবশ্যক।

কালগত বিচারে সমাজতন্ত্রকে দুইভাবে ভাগ রা যায় : কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopiam Socialism)-এর চিন্তা শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাবিদেরা মনে করতেন যে বিপ্লব নয়, প্রচারের মাধ্যমেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। শার্ল ফুরিয়ের, সেন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন প্রমুখ ছিলেন এই ঘরানার দার্শনিক। প্রুধোঁ ও তাঁর সমমনারা সামজতন্ত্রের নামে নৈরাজ্যবাদী দর্শন হাজির করেন।

১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' প্রকাশ করলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, একমাত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারাশ্রেণির মুক্তি সম্ভব। এর ফলে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠে এবং বিশ্বের সকল সমাজতন্ত্রীদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। ১৮৬৫ সালে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স-এর উদ্যোগে 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭০ সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বে 'প্যারি কমিউন' গঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই

কমিউনের পতন ঘটে এবং ১৮৭২ সালে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' ভেঙে যায়। ১৮৮৯ সালে এঙ্গেল্স-এর উদ্যোগে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত হয়। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে। ১৯১৮ সালে লিবনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবার্গ জার্মানিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে ব্যর্থ হন এবং তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯২০ সালে লেনিনের নেতৃত্বে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গঠিত হয়।

ইতোমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে চীনে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের ধ্বংসাবশেষকে উচ্ছেদ করে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে নয়া গণতন্ত্র বা জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কোরিয়াও একইভাবে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। পরবর্তীকালে কিউবা, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাক, ইয়ামান, তাঞ্জানিয়া, জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি দেশে নতুন পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশসমূহে নতুন ধরনের সমাজতন্ত্র বা ইউরো-কমিউনিজমের তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকেই শুরু হয় সমাজতন্ত্রের পতন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজতন্ত্রকে বর্জন করে। চীনসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশও গ্রহণ করে মুক্তবাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের পথ।

সাম্যবাদ : Communism

সাম্যবাদ সাজতন্ত্রেরই উচ্চতর পর্যায়। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্যবাদের পার্থক্য প্রকারগত নয়, বরং মাত্রাগত। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে যৌথ খামার এবং সমবায়ী মালিকানা উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে; কিন্তু সাম্যবাদী পর্যায়ে থাকে এক ধরনের ব্যবস্থা—রাষ্ট্র বা সমগ্র জনগণের মালিকানা। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে শ্রমিক ও যৌথ খামারের কৃষকদের মধ্যে প্রভেদের অস্তিত্ব থেকে যায়; কিন্তু সাম্যবাদী পর্যায়ে তা সম্পূর্ণ লোপ পায়। একইভাবে সাম্যবাদী পর্যায়ে অন্যদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদেরও কোনো তারতম্য থাকে না। যে শ্রমিক সেই বুদ্ধিজীবী; যে কৃষক সেও তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানে বুদ্ধিজীবী। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন-শক্তির বিকাশের

ফলে প্রাচুর্য আসে। তখন আর মুদ্র ও পণ্যের অস্তিত্ব থাকে না—উৎপাদিত পণ্য মানুষের মধ্যে সরাসরি ও যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টিত হয়। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন ও বণ্টনের মূলকথা এই যে, 'প্রত্যেকে তার সাধ্যানুযায়ী শ্রম দেবে এবং প্রতেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনধারণের উপকরণ পাবে।' সাম্যবাদী সমাজে অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে। সাম্যবাদী বিকাশের পর্যায়ে রাজনৈতিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠান (Political and Legislative Institution)-সমূহের বিলুপ্তি ঘটে (withers away)। সমগ্র জনতা সাম্যবাদী জীবনপদ্ধতির কতগুলো সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম মেনে চলে। এইসব সাধারণ নিয়মই সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

এই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই থাকে না বিধায় এই সমাজে কোনো প্রকার চুক্তিরও অস্তিত্ব থাকে না। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে এবং পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকারও পরিসমাপ্তি ঘটে। বস্তুত সাম্যবাদী সমাজ অবস্থান করে অত্যন্ত উন্নত উৎপাদন-শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও আত্মশাসনের ভিত্তির ওপর ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পথে প্রধানত তিনটি মৌলিক বিষয়ে নির্ধারক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই তিনটি মৌলিক বিষয় হলো : ১. সাম্যবাদের বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি সৃষ্টি; ২. সাম্যবাদী সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ এবং ৩. সাম্যবাদী সমাজের যোগ্য মানুষ গড়ে তোলা। সাম্যবাদী সমাজের মানুষ হয় সর্বোচ্চ সচেতনতাসম্পন্ন মানুষ। তাদের মধ্যে নিখুঁত শারীরিক স্বাস্থ্য, নৈতিক উচ্চমান ও আত্মিক সম্পদের সমন্বিত বিকাশ ঘটে। এই সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে স্থাপিত হয় অসাধারণ ও অনবদ্য সম্পর্ক।

উল্লেখ্য যে, সাম্যবাদী সমাজের উপরিউক্ত চিত্র এখনো তত্ত্বে সীমাবদ্ধ। বিশ্বের কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজকেই সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ঘটানো সম্ভবপর হয় নি। বরং তার বিপরীতে বহু সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে ফিরে এসেছে।

ভাববাদ : Idealism

ভাববাদ বস্তুবাদের বিপরীত। ভাববাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত ও পারস্পরিক কারণে নয় বরং একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুসারেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়ে চলছে। ভাববাদের

মতে বাহ্যিক বস্তুসমূহ প্রকৃত নয়, এসব বস্তু ভাবেরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। অর্থাৎ, প্রকৃতি বা বস্তুর ওপর ভাব বা আত্মাকে স্থাপন করে বলে এবং ভাব বা আত্মাকে বস্তুর সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে গ্রহণ করে বলেই এই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ। ভাববাদ অনুযায়ী, ১. বিশ্ব আসলে পরমভাব (Absolute Idea), সর্বজনীন আত্মা বা পরমাত্মা (Universal Spirit), প্রাণশক্তি (Elan Vital) বা সৃজনশীল শক্তি (Creative Force) ইত্যাদিরই প্রতিবিম্ব (Reflection)-মাত্র; ২. মনই হলো একমাত্র মৌলিক বাস্তব সত্য আর জগৎ বা প্রকৃতি বা বস্তুর অস্তিত্ব কেবল মনে, ধারণায় ও ভাবে আছে; ৩. সৃষ্টি, প্রকৃতি ও তার নিয়মাবলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয় এবং বিজ্ঞান কোনোদিনই প্রকৃতির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে না। মার্কসবাদের মতে, ভাববাদ শোষক-শাসকেরই আদর্শ; ভাববাদের মাধ্যমেই ধর্মজাযকেরা সবকিছুকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়।

পরম ভাববাদ : Absolute Idealism

দার্শনিক হেগেলের মতে, আত্মা ও অনাত্মার (বাহ্যজগতের) পেছনে এক পরমভাব (Absolute Idea) রয়েছে এবং তা আত্মাপরমাত্মা-বহির্ভূত তৃতীয় শক্তিরূপে নয়, বরং আত্মা ও পরমাত্মার অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যেই তার অস্তিত্ব। পরম ভাববাদ অনুযায়ী, চেতনা ও বস্তু পরমভাব বা পরমাত্মারই ক্রমবিকাশ।

বাস্তব ভাববাদ : Practical Idealism

দার্শনিক শেলিং (Schelling) এই মতের প্রবক্তা। তাঁর মতে বস্তু ও আত্মা সমভাবেই বাস্তব ও ভাবাত্মক এবং পরমসত্তা (Absolute) থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি।

পরম বা চরম সত্তা : Absolute

ভাববাদী দর্শনে 'পরমসত্তা' একটি মৌলিক ধারণা। এই দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরমসত্তা হলো চরম সম্পূর্ণ এক অস্তিত্ব। সমস্ত খণ্ড-অস্তিত্ব পরমসত্তার প্রকাশ। কিন্তু কোনো খণ্ড-অস্তিত্ব নিজ শক্তিবলে পরমসত্তার কোনো হানি বা অপূর্ণতা ঘটাতে পারে না। পরমসত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। খণ্ড-অস্তিত্বের সাধারণ সম্মিলনেও পরমসত্তার সৃষ্টি নয়। পরমসত্তা যাবতীয় সৃষ্টির মূলশক্তি। পরমসত্তা নির্বিশেষ সত্তা। পরমসত্তা সর্বপ্রকাশ বিশেষ-

প্রকাশনিরপেক্ষ। পরমসত্তা বিভিন্ন ভাববাদী দার্শনিকের তত্ত্বে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর দর্শনে পরমসত্তা 'দি আইডিয়া' বা বস্তুনিরপেক্ষ ভাব বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ফিখতে অহংবোধ 'আমি'কে পরমসত্তা বলেছেন। হেগেলের দর্শনে পরমসত্তাকে এক সার্বিক-ও পরমভাব বলে প্রকাশ করা হয়েছে। শাপেনহার 'ইচ্ছাশক্তি'কেই পরমসত্তা বলেছেন। বার্গসা একে ইনটুইশন বা সজ্ঞা বলেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে পরমসত্তা বলে অভিহিত করা হয়।

পুঁজি / মূলধন : Capital

মুনাফার উদ্দেশ্যে শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থই হলো পুঁজি বা মূলধন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজি হলো প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি উপাদান। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি, যন্ত্র, শ্রম ও পুঁজি এই চারটি উপাদান প্রধান। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে 'পুঁজি' শব্দ দ্বারা নতুন পণ্য ক্রয়ের আর্থিক সামর্থ্যকে বুঝায়। পুঁজি বলতে কেবল টাকা নয়, মালিকের মালিকানাধীন দালানকোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য বুঝাতে পারে। 'জাতীয় পুঁজি' দ্বারা দেশের শিল্পে উৎপাদিত সমগ্র পণ্য এবং অধিকতর পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদকে বুঝায়। পুঁজি প্রধানত দুই প্রকার : ১. স্থির/অপরিবর্তনশীল পুঁজি (যেমন, কলকারখানা, ইমারত ইত্যাদি); ২. চলতি/পরিবর্তনশীল পুঁজি (যেমন, কাঁচামাল, শ্রমিকের মুজুরি ইত্যাদি)।

মার্কসবাদের মতে, পুঁজিই হলো পুঁজিবাদী শোষণের ভিত্তি। কার্ল মার্কস বলেছেন, 'পুঁজি কোনো বস্তু নয়, পুঁজি হলো একটা সামাজিক সম্পর্ক। বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে উৎপাদনের যেসব উপকরণ রয়েছে সেগুলো নিজগুণে মূলধন নয়। শুধু বিশেষ একটা সামাজিক ব্যবস্থাই এসব বস্তুকে শোষণের উপকরণে পরিণত করেছে।' লেনিনের মতে, 'মূলধন হলো ইতিহাস-নির্দিষ্ট একটা সামাজিক সম্পর্ক।' মূলধন হলো এমন একটি মূল্যসমষ্টি যার কাজই হলো মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তিকে অর্থৎ শ্রমিককে শোষণ করা। শিল্পে বিনিয়োজিত মূলধনের দ্বারা অক্রয়কৃত শ্রম (Unpaid Labour) গ্রাস করা হয় সরাসরি; আর ব্যবসায়ী, জমিদারি বা মহাজনি পুঁজির ক্ষেত্রে এই গ্রাসের কাজটি করা হয় পরোক্ষভাবে। বস্তুত, শিল্পে নিয়োজিত মূলধন অক্রয়কৃত শ্রমগ্রাসের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে এবং মুনাফা উৎপাদন করে।

পুঁজিবাদ : Capitalism

মার্কসীয় মতে, সামন্তবাদকে অপসারিত করে তার স্থলাভিষিক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হলো পুঁজিবাদ; পুঁজিবাদের মূলভিত্তি হলো—ক. উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং খ. উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ। সময়ে সময়ে সঙ্কট, বেকারত্ব, ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য, অবাধ প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ইত্যাদিকেই পুঁজিবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়। পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব হলো, সামাজিকীকৃত শ্রমরূপের সঙ্গে ভোগের পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত রূপের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে এই সমাজের দুই প্রধান শ্রেণি বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। পুঁজিবাদের প্রবক্তারা বাহ্যত রাজনৈতিক সাম্যের ঘোষণা করলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এই ঘোষণা কার্যত প্রহসনেই পরিণত হয়। পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা রাষ্ট্রযন্ত্রসহ যাবতীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে রাখে, যাতে মেহনতি বা দরিদ্র মানুষ কখনোই পুঁজিপতিদের সমকক্ষ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা আইনগত অধিকার ভোগ করতে না পারে। যেমন, তারা নির্বাচনব্যবস্থাকে এমনই একটা ব্যয়বহুল ব্যবস্থা হিসেবে বজায় রাখে যাতে কাগজে-কলমে যে-কেউ নির্বাচিত হতে পারে বলে বলা হলেও, মূলত ধনী ও তাদের প্রতিনিধিরাই নির্বাচিত হতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের উদ্ভব। সামন্তবাদের পটভূমিতে এর ভূমিকা ছিলো প্রগতিশীল। কেননা, পুঁজিবাদ তখন সামন্তবাদের তুলনায় উচ্চতর শ্রম-উৎপাদনের নিশ্চয়তা দিয়েছিলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে যায়, প্রতিষ্ঠিত হয় একচেটিয়া (Monopoly) এবং কুবেরতন্ত্র (Oligarchy)-এর আধিপত্য। আরো উদ্ভব ঘটে রাষ্ট্রীয় মনোপলি পুঁজিবাদের, যা মনোপলিসমূহের শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা সম্মিলন ঘটায় এবং প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধবাদকে উজ্জীবিত করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিলো মূলত এরই পরিণতি। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উদ্ভবের ফলে পুঁজিবাদ এক নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা আঞ্চলিক যুদ্ধ, স্থানীয় উত্তেজনা সৃষ্টি, স্নায়ুযুদ্ধ, প্রভাববলয় সৃষ্টি, অর্থনৈতিক আগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে টিকে থাকার প্রয়াস পায়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সমাজবিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য তারা বিভিন্ন সংস্কারমূলক ও আপোসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিণামে, অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা ও গতিহীনতার দরুন বিংশ

শতাব্দীর আশির দশক থেকেই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ভিত অতি দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে, আর পুঁজিবাদ পরিবর্তিত বিশ্ব ও জাতীয় পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে অধিকতর সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়।

শ্রেণিসংগ্রাম : Class stuggle

বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক সংগ্রামই হলো শ্রেণিসংগ্রাম। অন্য কথায় শোষক ও শোষিতের সংগ্রামই হলো শ্রেণিসংগ্রাম। দাসসমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত প্রতিটি শোষণমূলক সমাজের ইতিহাসই মূলত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। শোষণমূলক সমাজ পরিবর্তনের মূলেই হলো শ্রেণিসংগ্রাম। পুঁজিবাদী সমাজে সংগ্রাম মূলত বুর্জোয়াশ্রেণির সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণিকে উৎখাত করে সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী সমাজ তথা শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটতে পারে। সর্বহারা শ্রেণি বা সর্বহারা শ্রেণির পার্টি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণিঅস্তিত্ব লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত শ্রেণির অস্তিত্ব টিকে থাকে বলে শ্রেণি সংগ্রামও বলবৎ থাকে। তবে শোষকশ্রেণি ক্ষমতায় না থাকায় এ-পর্যায়ে শ্রেণিসংগ্রামের রূপও পাল্টায়। স্ট্যালিনের মতে সর্বহারাশ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণিসংগ্রামকে বরং তীব্রতর করতে হয়। কিন্তু সংশোধনবাদীদের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রেণিসংগ্রামের আর প্রয়োজনীয়তা নেই।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে শ্রেণিসংগ্রামের রূপের ক্ষেত্রে নবতর বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। কারণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ শ্রেণিসংগ্রামকে ঠেকানোর অন্যতম কৌশল হিসেবে তাদের নিজ নিজ দেশের শ্রমিকশ্রেণিকে ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তা দানের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে বিলাসের সুযোগও দিচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের আচরণে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, অনুন্নত দেশসমূহে, যাদের প্রায় সবাই কোনো-না-কোনো ঔপনিবেশিক শক্তির উপনিবেশ ছিলো, পুঁজির বিকাশের কালে পুঁজির বিকাশ ঘটে নি বলে এবং বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এসব দেশে একেবারে স্বাধীন পুঁজির বিকাশ ঘটা সম্ভবপর নয় বলে প্রায়শই শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণির অস্তিত্ব তেমন একটা দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, সমাজ স্পষ্টরূপে দুটি চূড়ান্ত শ্রেণিতে বিভক্ত নয় এবং বিশাল ও শক্তিশালী মধ্যবর্তী স্তর বিদ্যমান থাকায় এখানে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ধ্রুপদীরূপে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে

না। ফলে বর্তমান বিশ্বে রুশ বা চীনা ধরনের শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লব বলতে গেলে অসম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদ : Imperialism

সাধারণ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ বলতে কোনো রাষ্ট্র বা জাতি কর্তৃক অপর কোনো রাষ্ট্র বা জাতির ওপর শাসন ও প্রভুত্ব বোঝায়।

এই ব্যাপক অর্থে ইতিহাসের প্রাচীনকালেও সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে সুমেরীয়, মিসরীয়, আসিরীয়, পারস্য, রোম ও চীন সাম্রাজ্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ইতিহাসে ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। অপরের ওপর নিজের সভ্যতা ও শাসন বিস্তার করে প্রভুত্ব কায়েম করা, অসম আচরণ, অত্যাচার ও শোষণের মাধ্যমে অধীন জাতির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী রাখার ইচ্ছা, ব্যবস্থা ও কৌশল ইত্যাদিতে প্রাচীন ও আধুনিক সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। অতীতকালে সাম্রাজ্যবিস্তারের একটা প্রধান প্রেরণা ছিলো কোনো বিশেষ সম্রাট বা জাতির নিজের ক্ষমতার পরিচয়দানের ইচ্ছা। অপর জাতির শোষণ ও দমনের মধ্যে প্রভু জাতি ও তার সম্রাট নিজের শৌর্য-বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখতে পেতো।

এই মিল থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ ও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ এক নয়। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস, তার প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি পররাজ্য গ্রাসের কারণ প্রাচীনকালের তুলনায় ভিন্নতর ও জটিল। আধুনিক কালের সাম্রাজ্যবাদের যথোপযুক্ত সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছেন রুশ বিপ্লবের নেতা ভি আই লেনিন। তিনি তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের চরম স্তর' নামক গ্রন্থে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়ে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ-বিকাশের একটা বিশেষ স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত; ২. পুঁজিবাদের জাতীয় ভিত্তিক বিকাশ নিঃশেষ হলে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে পুঁজিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ইংল্যান্ড সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রূপ গ্রহণ করে; ৩. সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ও পুঁজি কেন্দ্রীভূত হতে হতে গুটিকয় একচেটিয়া অর্থনৈতিক পরিবার বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে এই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিদের

করায়ত্ব হয়ে পড়ে; ৪. কালক্রমে একচেটিয়া ব্যাঙ্কপুঁজি একচেটিয়া শিল্পপুঁজির সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থনৈতিক স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায়; ৫. অধীন দেশে উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানির স্থলে পুঁজি রপ্তানি ক্রমান্বয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়; ৬. বিভিন্ন সাম্রাজ্যের একচেটিয়া পুঁজিপতিগণ সম্মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশ্বের সমস্ত দুর্বল জাতিকে শোষণ ও শাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার চেষ্টা করে। লেনিন মনে করতেন যে, পুঁজিবাদের এরূপ বিকাশ তার অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের পরিচায়ক। যে-পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাসে একসময়ে সম্ভাবনাময় অগ্রসর শক্তির কাজ করছিলো, সাম্রাজ্যবাদের স্তরে সে-পুঁজিবাদের বিকাশ-সম্ভাবনা নিঃশেষিত। সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুঁজিবাদের সঙ্কট অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকারী বিপ্লবী অবস্থার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আধুনিক কালের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়লেও তাদের অস্তিত্ব আজো বিলুপ্ত হয় নি। তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার নতুন নতুন কৌশল তারা উদ্ভাবন করছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক : First International

১৮৬৪ সালে কার্লমার্কস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বহারাশ্রেণির প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রথম আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণির আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। ১৮৭২ সালে এই আন্তর্জাতিকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এর অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৮৭২ সালের ২-৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হেগ কংগ্রেসে নৈরাজ্যবাদ ও পেটিবুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদ ও পেটিবুর্জোয়া সুবিধাবাদের ওপর মার্কসবাদের বিজয় সূচিত হয় এবং বাকুনিন, গিল্যোম প্রমুখ প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন। মার্কস ও এঙ্গেল্স-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেস ভবিষ্যতে মেহনতি মানুষের জাতীয় রাজনৈতিক পার্টি গঠনের পথকে প্রশস্ত করে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক : Second International

১৮৮৯ সালে গঠিত সমাজতান্ত্রিক পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯১৪-১৯১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বহু নেতা সামজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন এবং নিজ নিজ দেশের

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে যোগ দেন। ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে যায়। ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনেক নেতা এতে যোগ দেন। তবে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক পার্টিসমূহের নেতারা বার্ন শহরে মিলিত হয়ে (১৯১৯) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। অবশ্য এঁরা আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদীদের প্রতিভূরূপেই চিহ্নিত হন।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক : Third International

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিনটার্নের প্রথম কংগ্রেসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত এই আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব দেন লেনিন। এই আন্তর্জাতিক গঠনের ফলে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয় এবং নয়া কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের শক্তি ও প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণেও এই আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-আন্দোলনের যে-সাংগঠনিক রূপ একটা ঐতিহাসিক পর্যায়ের প্রয়োজন মিটিয়েছিলো, এখন সে পর্যায় অতিক্রান্ত—এই যুক্তিতে ১৯৪৩ সালের মে মাসে তৃতীয় আন্ত র্জাতিকের কার্যকরী কমিটি এই আন্তর্জাতিকেরও অবলুপ্তি ঘটায়।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক : Fourth International

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে লিওন ট্রট্স্কি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ১৯৩৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে চতুর্থ আন্ত র্জাতিক গঠন করেন। কিন্তু এই আন্তর্জাতিক তেমন একটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। ১৯৫৩ সালে এই আন্তর্জাতিক দ্বিধাবিভক্ত ও কার্যত তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

নির্দয় ধর্মীয় বিচার : the Inquisition

'ইনকুইজিশন' শব্দের অর্থ 'বিচারের জন্য অনুসন্ধান' হলেও ইউরোপের ইতিহাসে ইনকুইজিশন বলতে ধর্মান্ধতার যুগে ধর্মীয় প্রতিপক্ষ অথবা ধর্মীয় গোঁড়া সংস্কার ও বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও নির্দয় বিচারব্যবস্থাকে বোঝায়। ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারের সূচনা ঘটে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। খ্রিস্টান যাজকগণ

যাদেরকে অবিশ্বাসী বা খ্রিস্টীয় ধর্মবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করতো তাদের বিচার করার জন্য তদন্তকারী ও বিচারক নিযুক্ত করতো। খ্রিস্টীয় যাজকদের এই বিচারব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রের খ্রিস্টান সম্রাটগণ অনুমোদন করেন। যাঁরা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে অন্যকোনো ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণ করতো তাদের বিরুদ্ধেও ইনকুইজিশন-ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হতো। গোড়ার দিকে ধর্মত্যাগী বা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা আদায় ছাড়া দৈহিকভাবে নিপীড়ন করা না হলেও ক্রমান্বয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখা, নির্মম নির্যাতন ও অত্যাচার, অভিযুক্তকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে হত্যা করা 'ইনকুইজিশন'-এর অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এ-বিচারব্যবস্থায় অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হতো না। দুজন লোকের গোপনীয় অভিযোগের ভিত্তিতে যে-কোনো নাগরিককে এই ধর্মীয় তদন্ত-আদালতের কাছে সোপর্দ করে তাকে দণ্ডিত করা যেতো। 'ইনকুইজিশন' চরম রূপ গ্রহণ করে স্পেনে, পঞ্চদশ শতকে। স্পেনীয় 'ইনকুইজিশন'-এর প্রধান লক্ষ্য ছিলো ওইসব ব্যক্তি যারা খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো বা ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস করতো। স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলা যাকে প্রথম ইনকুইজিটার বা প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন সে তার কার্যকালে দু-হাজার লোককে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেছিলো। 'ইনকুইজিশন'-এর আতঙ্কে মধ্যযুগের ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষকগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বা মতামত প্রকাশ করতে সাহস পেতেন না। এই সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অনেক চিন্তাবিদ ও মুক্তবুদ্ধির মানুষকে এই ধর্মীয় বিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তাঁদের মধ্যে ইউরোপীয় পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা গিওর্দানো ব্রুনোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর যুক্তিবাদী ও স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁকে ইনকুইজিশনের হুকুমে ১৬০০ সালে রোম শহরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি

১৯৭৭ সালের শেষের দিকে ব্রিটেনে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আকস্মিকভাবে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরই সূত্র ধরে ১৯৭৮ সালের ৫-১৭ সেপ্টেম্বর সময়ে ওয়াশিংটন থেকে ৬৭ মাইল দূরবর্তী ক্যাম্প ডেভিড নামক স্থানে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপনের জন্য নির্মিত প্রাসাদ বার্চ লজ (Birch

Lodge) ও ডগউড লজ (Dogwood Lodge)-এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এর পরিণতি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে সাব্যস্ত হয় যে, ১. সিনাই এলাকা মিসর ফিরে পাবে; ২. গাজা ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর পাঁচ বছরের জন্য স্বায়ত্তশাসন পাবে এবং ৩. পশ্চিম তীরে ইসরাইলি সৈন্য বহাল থাকবে। এই চুক্তিতে পি.এল.ও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন)-এর ব্যাপারে কোনো উল্লেখই ছিলো না, যদিও পি.এল.ও-ই ফিলিস্তিনি জনগণের জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। এই চুক্তিতে গোলান মালভূমির ব্যাপারেও কোনো উল্লেখ না থাকায় সিরিয়ার সমস্যাও আগের মতো থেকে যায়। সর্বোপরি, বিতাড়িত ফিলিস্তিনিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের প্রশ্ন, ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্ন এবং ১৯৬৭ সালে অধিকৃত বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য এলাকা প্রত্যর্পণের প্রশ্নও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকে। এই চুক্তির ফলে আরব বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ইহুদিরা আরো বেপরোয়াভাবে তাদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়। অবশ্য এই চুক্তির ফলে মিসর তার হারানো এলাকা ফিরে পায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যা ও উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সমস্যা ও উত্তেজনাই ১৯৮২ সালের জুন-জুলাই মাসে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

ইয়ালটা সম্মেলন

১৯৪৫ সালের ৪-১৪ই ফেব্রুয়ারি ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইয়ালটায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং রাশিয়ার স্ট্যালিনের মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জার্মানিকে পরাজিত ও দখল করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাব্যস্ত হয় যে, এই তিন শক্তিই জার্মানির এক-একটা অংশ দখল করবে, ফ্রান্সকে একটা অংশ দখলের জন্য আহ্বান জানানো হবে এবং সমন্বয়ের জন্য বার্লিনে চার বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এই সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, জার্মান সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়া হবে, সমস্ত জার্মান অস্ত্র দখল করা হবে অথবা ধ্বংস করে দেয়া হবে, যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তি দেয়া হবে, জার্মান সামরিক

কারখানাসমূহ হয় ভেঙে দেয়া হবে নতুবা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে এবং জার্মানবাসীর জীবন থেকে সকল নাৎসি প্রভাব নির্মূল করা হবে।

ডাম্বার্টন ওক্‌স্ সম্মেলনের সূত্র ধরে এই সম্মেলনে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, আসন্ন এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে প্রস্তাবিত জাতিসঙ্ঘ সনদ প্রস্তুত করা হবে। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ-সংক্রান্ত রুজভেল্টের তিনটি প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং স্থায়ী সদস্যদের ভেটোক্ষমতার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতোপূর্বে দাবি করেছিলো যে, তার ১৬টি প্রজাতন্ত্রের জন্য জাতিসঙ্ঘে ১৬টি আসন চাই। কিন্তু এই সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একমত হয় যে, রুশ ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ছাড়া শুধু ইউক্রেন প্রজাতন্ত্র ও বাইলোরুশিয়া প্রজাতন্ত্রের জাতিসঙ্ঘে আসন থাকবে। তিন নেতা এ-ব্যাপারেও একমত হন, নাৎসি কবলমুক্ত ইউরোপীয় যে-কোনো দেশে তাঁরা সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠন করে দিতে বা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন। এতদিন যাবৎ লন্ডনস্থ প্রবাসী প্যোল্যান্ড সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সমর্থন দিয়ে আসছিলো। এই সম্মেলনে তাঁরা তা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, পোল্যান্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং এর পূর্বে সীমান্তে কার্জন লাইন মেনে চলতে হবে।